ইউনিট ৪: শিক্ষা পরিকল্পনা, পেশাদার শিখন সমাজ এবং তত্ত্বাবধান
Educational Planning, Professional Learning Community and Supervision

ভূমিকা

মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষা। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। বর্তমান বিশ্বগ্রাম (GlobalVillage) ও ইন্টারনেট (Internet) শিক্ষায় এনেছে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। তাই শিক্ষা পরিকল্পনায় বর্তমানে নানামুখী বৈচিত্রময়তার সমাহার ঘটেছে। ধ্রুপদী যুগের (Classical Period) অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে সমসাময়িক (Contemporary) অমর্ত্য সেন পর্যন্ত প্রায় সকল অর্থনীতিবিদগণ শিক্ষাকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, অভিজ্ঞতার পুর্নগঠন ও পুন:সৃজন, বাস্তব সমস্যার সমাধান, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানবতার সর্বজনীনতাকে ইতিবাচক রূপে গ্রহণ, পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বজাতি গঠনে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করার মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ দার্শনিক জন ডিউই (John Dewey) শিক্ষার ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন, “Education is not a preparater of life, mother it is living”. অর্থাৎ শিক্ষা শুধু জীবন প্রস্তুতির উপায় নয়, তা জীবনযাপন প্রণোদিত ও বটে”। শিক্ষার গুরুত্ব তাই প্রাচীন মিশর, গ্রিক, রোমান, স্পার্টান, চৈনিক, ভারতীয় সভ্যতা হতে উত্তর আধুনিক (Post Modern) সভ্যতায় বিশেষ মর্যাদার আসন হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। শিক্ষার কয়েকটি মৌলিক উপাদান ও বৈচিত্র্য দিক আছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো পরিকল্পনা। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা পরিকল্পনার বিভিন্নতা সেসব দেশের সংবিধান ও সরকারের অভিরুচি অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

এই ইউনিটে শিক্ষা পরিকল্পনা “পেশাদার শিখন সম্পদ এবং তত্ত্বাবধান” মোট এগারোটি পাঠে আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৪.১	:	শিক্ষা পরিকল্পনা– প্রয়োজনীয়তা, ধারণা, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য, ধাপ এবং মূলনীতি
পাঠ- ৪.২	:	পরিকল্পনার ধরন– মাইক্রো এবং ম্যাক্রো
পাঠ- ৪.৩	:	কৌশল– কার্যকরী দৃষ্টিকোন (Operational Perspective) থেকে বিষয়বস্তুর গভীরতা নির্ণয় মাধ্যম, প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নগত পরিকল্পনা
পাঠ- ৪.৪	:	শিক্ষা পরিকল্পনার বিভিন্ন পন্থা– সামাজিক, মানবসম্পদ গত, বিনিয়োগ ফেরত, সিস্টেম পন্থা
পাঠ- ৪.৫	:	পেশাভিত্তিক শিখন সমাজ
পাঠ- ৪.৬	:	অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি/চর্চার উন্নয়ন
পাঠ- ৪.৭	:	সাংগঠনিক বিদ্যমান অবস্থা– সংজ্ঞা, গুরুত্ব, ধরণ এবং ব্যাপ্তি
পাঠ- ৪.৮	:	তত্ত্বাবধান– ধারণা, অর্থ, শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্বাবধানের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য
পাঠ- ৪.৯	:	তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য, পেশা হিসেবে তত্ত্বাবধানের প্রক্রিয়া ও কার্যতৎপরতা
পাঠ- ৪.১০	:	তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপালন– আধুনিক তত্ত্বাবধান কৌশল, গতিধারা, পেশাগত প্রশিক্ষণে পরিকল্পনা ও এবং নিয়ন্ত্রণ

পাঠ- ৪.১: শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, ধারণা, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য, ধাপ এবং মূলনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষা পরিকল্পনা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবেন।
- শিক্ষা পরিকল্পনার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপ বা মাত্রা সম্পর্কে বিবৃত করতে পারবেন।
- শিক্ষা পরিকল্পনার মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা পরিকল্পনা

পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত কোন কার্যক্রম সফল হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হলো শিক্ষা পরিকল্পনা। শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর বয়স, সংখ্যা, সুযোগ-সুবিধা, শ্রেণিকক্ষের আয়তন ও আসন বিন্যাস, পাঠ্যসূচি, শিক্ষা সহায়ক অন্যান্য কর্মসূচি, আয়-ব্যয়ের হিসাব, সহপাঠ কার্যক্রম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার সর্বজনীন প্রসার, শিক্ষার মান বৃদ্ধি, জীবনমুখী শিক্ষা, সময়ের চাহিদা পূরনে শিক্ষার বিষয়গুলো সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আবার বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কারিগরী ও প্রযুক্তি শিক্ষাকেও শিক্ষা পরিকল্পনায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তবে শিক্ষা বিষয়ে শুধু পরিকল্পনা নয়, বাস্তবায়নের জন্য দিক নির্দেশনা থাকাও অতীব জরুরি। কারণ একটি দেশের উন্নয়ন সে দেশের শিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা হলো নির্দিষ্ট শিক্ষায়তনের শিক্ষামূরক নির্দেশনা, জ্ঞান, দক্ষতা বা কৌশল আয়ত্তকরণ। বর্তমান বিশ্ব ক্রমশই প্রযুক্তি নির্ভর সমাজের দিকে এগিয়ে চলেছে। জনসংখ্যা, মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশ বিদ্যা, ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপরিকল্পিত ও অপব্যবহার ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আর এর মাধ্যমে রাষ্ট্র তার শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। দেশের অর্থনীতিতে শিক্ষিত মানব সম্পদের খাতওয়ারি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরুপনে শিক্ষা পকিল্পনা করা আবশ্যক। পরিকল্পিত সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও হার কিরূপ হবে, কি পরিমাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় (আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক), মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, কৃষি ও পশুপালন মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি প্রয়োজন হবে তাও নির্ণয় করতে হয়।

কাঙ্খিত শিক্ষার্জনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি শিক্ষার্থীর আসন বিন্যাস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকের চাহিদা, চাহিদা পুরণের উপায়, অবকাঠোমো নির্মাণে অর্থ ও ভৌত সুবিধার প্রয়োজন ইত্যাদি চিহ্নিত করে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা

পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে– ইউনেস্কোর শিক্ষা পরামর্শক এবং নাইজেরিয়ার বেনিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ টি.এম উসুফু (T. M. Yosufu) বলেন, "Educational planning as a scientific process is applicable is all countries..... In the poor countries, however, it in of special relevance, partly because of prevailing high degrees of illiteracy and parity because of the extreme scarcity of resources which must, therefore, be spread both thinly and wisely".

শিক্ষা পরিকল্পনার সংজ্ঞা

আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই শিক্ষা পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের পরিকল্পনাবিদগণ দেশের অর্থনীতিকে সাধারণত বিভিন্ন খাতে (Sector) বিভক্ত করে থাকেন। এসব খাতের মধ্যে রয়েছে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি। তাই কোন দেশের আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় পরিকল্পনাবিদগণ শিক্ষাকে সামগ্রিক অর্থনীতির একটি খাত হিসেবে নির্দেশ করে শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেদে শিক্ষা পরিকল্পনায় ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। পরিকল্পনার নিম্নোক্ত সংজ্ঞা হতে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

রবার্ট এ. ডাল এর মতে, "Planning is more and more regarded as equivalent to rational social action, that is as a social process for reaching a rational decision".

আলবার্ট ওয়াটার স্টোন পরিকল্পনার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো, "It represents the rational application of human knowledge to the process of reaching decisions a which are to serve as the basis of human action".

সাবেক সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ সি. এইচ. তুরেস্কি পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন, "By planning we mean the fullest and most rational utilization of all work and of all the material resources of the community, in the light of a scientific forecast of the trends of economic development and with strict observance of the laws of social development".

প্রকৃতি (Nature)

শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও সময়ের বাস্তব চাহিদা মোতাবেক গড়ে তোলার জন্য পাশ্চাত্যের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা পরিকল্পনার প্রকৃতি, ধারণা, পদ্ধতি ও কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। তাই শিক্ষা সম্পর্কিত কোন কাজ কখন, কিভাবে, কাদের মাধ্যমে সুচারুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব ইত্যাদি সম্পর্কিত রূপরেখা শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষা পরিকল্পনা হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষানীতির সমাবেশ বা বিভিন্ন লক্ষ্য স্থির করে এবং তদানুযায়ী লক্ষ্য অর্জনের পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

শিক্ষা পরিকল্পনা একটি দীর্ঘ মেয়াদী ও সচল প্রক্রিয়া। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। তবে ঐতিহাসিক ডোনা এইচ. কারের (Donna H. Kerr) মতে, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সব সময় একই রকমের হবে বা পূর্বধারা অব্যাহত থাকবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারের চারিত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। সাধারণত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তির চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খাতে প্রাধান্য দিয়ে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা করা হয়। আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা পরিকল্পনার

উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। তবে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার কারণে ঐ সব দেশে গতিশীল শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। আবার শিক্ষায় বিনিয়োগ তাৎক্ষণিক দৃষ্টিগোচর হয় না বলে শিক্ষার তাৎপর্যকে অনেক সময় যথার্থরূপে মূল্যায়ন করা হয় না। সর্বোপরি শিক্ষা পরিকল্পনার কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় যা প্রয়োগ করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। এই সময়টি হলো কোন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা সমাপাপ্তে কর্মে নিয়ুক্ত হওয়া পর্যন্ত। শিক্ষা পরিকল্পনায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপগুলো (Aspects) সব সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ না ও হতে পারে। জাতীয় উদ্দেশ্যে সাধনে কোন কোন পর্যায়ে স্পল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে একীভূত করা হয়। আবার জাতীয় প্রয়োজনে অর্ন্তবর্তীকালীন পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

যে কোন আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনারও কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. **প্রক্রিয়া:** শিক্ষা পরিকল্পনা এমন একটি নিরবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রক্রিয়া যেটি সম্পন্ন করার জন্য প্রক্রিয়া (Input) হিসেবে সম্পদের প্রয়োজন।

২. **প্রস্তুতি:** শিক্ষা পরিকল্পনা হলো একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া যা সরাসরি কোন সংস্থার মাধ্যমে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়।

৩. **সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য সাধারণত পরিকল্পনাবিদ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উচ্চমান সম্পন্ন সিদ্ধান্ত প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এরপর পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসচেতনতা ও জনসম্পর্ক উন্নয়ন করতে হয়। এরপর বাস্তবায়নে কাজ করতে হয়।

৪. **ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি:** শিক্ষা পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। এতে সমসাময়িক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের অভিক্ষেপ/প্রক্ষেপন (Projection) করা হয়। পরিকল্পনাধীন সময়ে ক্রমাগত পুনমূল্যায়ন (Re-evaluation), অভিযোজন (Adjustment) প্রভৃতির মাধ্যমে নমনীয় (Flexible) পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

৫. **লক্ষ্যাভিমুখীতা:** শিক্ষা পরিকল্পনার কর্মপন্থায় অনেকগুলো সুপারিশ গৃহীত হয়ে থাকে। তবে সবসময় সবগুলো সুপারিশ বাস্তবায়িত নাও হতে পারে। প্রায়ই পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ের সুপারিশের আলোকে নীতি (Policy) নির্ধারণ করা হয়।

৬. **কাঙ্খিত উপকরণ:** শিক্ষা পরিকল্পনার কাঙ্খিত লক্ষ্য পুরণের উদ্দেশ্যে কিন্তু যৌক্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। যেমন– তথ্য সংগ্রহ, জ্ঞানের ব্যবহার, সংগৃহীত তথ্য ও পদ্ধতি কার্যপ্রণালী এবং কৌশলের মূল লক্ষ্যে থেকে সীমিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত উপকরণসমূহের সরবরাহ সুনিশ্চিত করা।

শিক্ষা পরিকল্পনার ধাপ

শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করা হয়। প্রধানত জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রণীত সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন হলো প্রকল্পের মূল দিক। জাতীয় উন্নয়নের বিদ্যমান অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে শিক্ষাবিষয়ক লক্ষ্যসমূহ প্রকাশ করতে হয়। রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনীয়তার সাথে সংগতি রেখে শিক্ষা পরিকল্পনা করা হয়। এসব ধাপ অনুসরণ করে শিক্ষা পরিকল্পনায় কিছু ধারাবাহিক কাজ করতে হয়।

১. **পরিকল্পনা পূর্ব অবস্থা পরখকরণ/ যাচাইকরণ:** শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নকালে পূর্ববর্তী শিক্ষা বর্ষগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নের গতি প্রকতি কিরূপ ছিল তা পরখ করতে হয়। এছাড়া শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে তা যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

২. **উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ:** প্রাপ্ত তথ্য ও বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যান যাচাই-বাছাইয়ের পর শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে শিক্ষার দীর্ঘ মেয়াদী পূর্বাভাস তৈরি করতে হয়। এ সময় সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষার উদেশ্যোবলী ও কৌশল নিধার্রণ করতে হয়।

৩. **বিকল্প ও উৎকৃষ্ট কার্য-পদ্ধতি গ্রহণ:** শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইনপুট ব্যবহার করে বিকল্প পদ্ধতি মূল্যায়ন করা হয়। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, অবকাঠামো, উৎপাদন, সম্ভাব্য বিনিয়োগের বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে সর্বাপেক্ষা উন্নত কর্মপদ্ধতিটি গ্রহণ করা হয়।

৪. **উপ-পরিকল্পনা গ্রহণ:** অর্থনীতির অন্যান্য খাতের (Sector) ন্যায় শিক্ষার জন্যেও বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। শিক্ষায় বিনিয়োগ করা হয়। সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। পরিকল্পনাধীন সময়ে কি পরিমাণ শিক্ষার্থীকে কোন পর্যায়ে কি ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হবে তাও নির্ধারণ করা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনায় বিদ্যালয়, মাদরাসা, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, শিক্ষা প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। ছোট ছোট পৃথক প্রকল্পভিত্তিক গৃহীত পরিকল্পনাকে উপ-পরিকল্পনা বলা হয়ে থাকে।

৫. **বাস্তবায়ন সময় ও কার্যকাল নির্ধারণ:** প্রতিটি শিক্ষা পরিকল্পনা শুরু ও সমাপ্তির নির্ধারিত সময়কাল থাকে। পরিকল্পনাকে ধারাবাহিকভাবে সমাপ্ত করার জন্য কোনগুলো পূর্বে এবং কোনগুলো পরবর্তীতে অথবা একই সময়কালে যৌথভাবে সম্পন্ন করা হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া পরিকল্পনা অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও পর্যবেক্ষণের সময়কালও সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হয়।

মূলনীতি

প্রতিটি দেশের শিক্ষা পরিকল্পনা সে দেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। বাংলাদেশের ন্যায় দরিদ্র ও সমস্যা সংকুল সদ্য স্বাধীন দেশের প্রথম শিক্ষানীতি প্রণয়ন কালে শিক্ষা কমিশন প্রধান ড. কুদরত-এ-খুদা বলেছিলেন, “শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা আকাঙ্খা রূপায়নের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণির জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অনুর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। শিক্ষার মূলনীতির সঙ্গে এই সাংবিধানিক নীতিমালার যোগ সাধন করে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করা যায়”।

১. জাতীয় আর্দশ ও লক্ষ্যে উদীপ্ত সামগ্রিক জাতীয় পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

২. জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্যকে মূলভিত্তি বিবেচনায় রেখে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। জনগণকে জনশক্তিতে রূপান্তরের বিষয়টি ছাড়াও জনগণের মধ্যে কাঙ্খিত মূল্যবোধ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত করার বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে।

৩. মানবসম্পদ উন্নয়নের বিনিয়োগ হিসেবে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষায় সম্পদ অর্থ-বিনিয়োগে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

৪. শিক্ষা পরিকল্পনাকে সর্বোতভাবে সার্থক করে তুলতে হবে সরকারি বেসরসারি আংশীদারিত্বের (Public-private participation) গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার সব স্তরের বিশেষজ্ঞগণের এবং তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষার বিদ্যোৎসাহীদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

৫. শিক্ষা পরিকল্পনায় সর্বজনীন, বিজ্ঞান সম্মত, যুগোপযোগী শিক্ষাকে প্রধান্য দিতে হবে। মাদরাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষাকেও আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ভাবধারায় পরিণত করতে হবে।

৬. সমাজের অনগ্রসর জাতি-গোষ্ঠিকে শিক্ষার মূল ধারায় আনার লক্ষ্যে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে হাওর অঞ্চল, পাহাড়ি দুর্গম জনপদ ও চরাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার করে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৭. সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্য যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নানাবিধ সংস্থা, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাব্রতীর সুপারিশ বাছাই করে গ্রহণ করতে হবে।

৮. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নকালে জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধকে সংহত ও প্রসারিত করার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় ঐক্যবোধ সুনিশ্চিত করার জন্যে গোষ্ঠিচেতনার উর্ধ্বে একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত সর্বজনীন পাঠক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. সমাজের প্রতিটি মানুষ যাতে নিজস্ব প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা পরিকল্পনা করতে হবে। নানা প্রকার কুসংস্কার, দুর্নীতি ও অনাচারের বিষয়ে যাতে শিক্ষার্থী সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারে তার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।

১০. জাতীয় পরিকল্পনার ব্যাপক লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে সময় বিশেষে শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনার ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

১১. একটি কৌশলী জনসম্পদ সৃষ্টির জন্য সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগমুখিতার মাধ্যমে মানসিক শ্রমের সঙ্গে উৎপাদনমুখী কারিগরি শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাছাড়া কৃষি, শিল্পকলা, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, বাণিজ্য শিক্ষক শিক্ষণ প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষা ধারার সম্প্রসারণে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১২. আর্থিক ও বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টির সাথে সম্পর্কহীন শিক্ষার প্রতি অনিচ্ছুক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের বিষয়টিকে শিক্ষা পরিকল্পনায় আনতে হবে। যে শিক্ষা দারিদ্র্য ও অন্যের প্রতি নির্ভরশীল থাকার মানসিকতার জন্ম দেয় সে ধরনের শিক্ষা গ্রহণের প্রতি জনগণকে অনিচ্ছুক করতে শিক্ষা পরিকল্পনায় বিশেষ স্কিম চালু করা প্রয়োজন।

১৩. দারিদ্র্য, প্রলোভন ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নারী-পুরুষ ভিক্ষাবৃত্তি ও রূপজীবির মতো অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত কার্য-কলাপে জড়িয়ে পড়ে। একে সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা তৈরি হয়। রাষ্ট্র ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বাধার সম্মুখীন হয়। তাই এদের সমাজের উপযোগী ও উৎপাদনমুখী করে তোলার জন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি শিক্ষা পরিকল্পনায় গৃহীত হতে হবে।

১৪. শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত স্তরভেদে চারু ও কারুকলা, ললিতকলা ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা পরিকল্পনা করতে হবে।

১৫. জনগণের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য গণপ্রচার মাধ্যমের (এফ.এম. রেডিও, সংবাদপত্র, বাংলাদেশ বেতার, চলচিত্র, টেলিভিশন, ফেসবুক) সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে শিক্ষা পরিকল্পনায় ব্যাপক কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন।

১৬. পিছিয়ে পড়া (Lack Behind), ঝরে পড়া (Dropout) প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য দূরশিক্ষণের বিষয়টি শিক্ষা পরিকল্পনায় থাকতে হবে। এছাড়া বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য অনানুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এতে করে তারা সমাজের বোঝা হয়ে থাকবে না এবং দক্ষ নাগরিক ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। এটিও শিক্ষা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা পরিকল্পনা–
ক. মূলনীতি ছাড়া রচিত
খ. পরিকল্পনা ব্যতীত হয়
গ. কতগুলো মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়
ঘ. সম্পদ বিনিয়োগ ব্যতীত রচিত হয়

২. ধ্রুপদী যুগের অর্থনীতিবিদ ছিলেন–
ক. অমর্ত্য সেন
খ. এ্যাডাম স্মিথ
গ. কার্ল মার্কস
ঘ. সি. এইচ তুরেস্কি

৩. বর্তমান বিশ্ব ক্রমশ প্রযুক্তির দিকে–
ক. এগিয়ে যাচ্ছে
খ. এগুচ্ছেনা
গ. নির্ভরতা কমাচ্ছে
ঘ. বরাদ্দ কমাচ্ছে

৪. শিক্ষা পরিকল্পনা হলো–
ক. শিক্ষানীতির সমাবেশ
খ. অর্থনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষানীতির সমাবেশ
গ. সামাজিক সমাবেশ
ঘ. অর্থনৈতিক সমাবেশ

৫. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সব সময় একই রকমের হবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কে বলেছেন–
ক. ই.এইচ.কার
খ. ডোনা এইচ. কার
গ. অমর্ত্য সেন
ঘ. এরিস্টটল

৬. শিক্ষা পরিকল্পনা–
ক. অতীত কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করে
খ. বর্তমান কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করে
গ. ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করে
ঘ. লক্ষ্যহীনভাবে কাজ করে

৭. শিক্ষা পরিকল্পনা করা হয়–
ক. দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার জন্য
খ. অদক্ষ জনশক্তি তৈরি করার জন্য
গ. নাগরিক সচেতনতা তৈরি করার জন্য
ঘ. নির্ভরশীল নাগরিক তৈরি করার জন্য

৮. বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়–
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়কালে
খ. জিয়াউর রহমানের সময়কালে
গ. হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের সময়কালে
ঘ. শেখ হাসিনার দ্বিতীয় সরকারের সময়কালে

৯. শিক্ষা পরিকল্পনাকে সর্বোতভাবে সার্থক করে তোলার জন্য–
ক. সরকারি বরাদ্দ বাড়াতে হবে
খ. বেসরকারি বরাদ্দ বাড়াতে হবে
গ. বিদেশি অর্থ সাহায্য বাড়াতে হবে
ঘ. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বাড়াতে হবে

১০. শিক্ষা পরিকল্পনাকে যুগোপযোগী করার জন্য–
ক. বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে
খ. চারু, কারু ও ললিতকলার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে
গ. প্রযুক্তি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে
ঘ. উপরোক্ত সবগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে

১১. জনগণের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিম্নের কোন মাধ্যমটিকে গুরুত্ব দিতে হবে?
ক. সংবাদপত্র
খ. টেলিভিশন
গ. বাংলাদেশ বেতার
ঘ. সবকটি

উত্তরমালা: ১.গ, ২.খ, ৩.ক, ৪. খ, ৫. খ, ৬. গ, ৭. ক. ৮. ক, ৯. ঘ, ১০. ঘ, ১১. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনার প্রকৃতি কিরূপ?
২. শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ডোনা এইচ কারের বক্তব্য লিখুন।
৩. শিক্ষা পরিকল্পনার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪. শিক্ষা পরিকল্পনার পাঁচটি ধাপ সম্পর্কে লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. শিক্ষা পরিকল্পনার মূলনীতিগুলোর বিবরণ দিন।

পাঠ- ৪.২: শিক্ষা পরিকল্পনার ধারণ– মাইক্রো এবং ম্যাক্রো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা কেন গ্রহণ করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনার কৌশল আলোচনা করতে পারবেন।
- মাইক্রো পরিকল্পনা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ম্যাক্রো পরিকল্পনা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা

সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বিভিন্নতার মত শিক্ষাক্ষেত্রেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, জেলা প্রভৃতির মাঝে সাধারণত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। কৃষি, শিল্প, প্রাকৃতিক দুর্গমতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবন অঞ্চল ভেদে এ বৈষম্য হয়ে থাকে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে (২০১০) শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে তাগিদ দেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান শিক্ষার বৈষম্য দূরীভূত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আবার কোন অঞ্চলের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একইভাবে শিক্ষার জন্য জেলাওয়ারী, থানাওয়ারী, পার্বত্য অঞ্চল, হাওরাঞ্চল ভেদে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

পরিকল্পনা কৌশল

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন অঞ্চলের বৈষম্য, অবকাঠামোগত পরিবেশ প্রভৃতি বিবেচনায় রেখে আঞ্চলিকভাবে বিতরণ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা যেতে পারে। এ ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা আঞ্চলিক পরিকল্পনা নামে অভিহিত।

আবার কোন অঞ্চলের পূর্ববর্তী বছরওয়ারী শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হার, শিক্ষার গতিপ্রকৃতি, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় রেখেও আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকেও বিবেচনায় নিতে হবে।

বাংলাদেশে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা সর্বদা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর সাফল্য নিয়ে আসতে পারে না। তাই বিভিন্ন শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ এবং অর্থনীতিবিদ বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা (Centralized) হলো এমন একটি পরিকল্পনা যা কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ পরিকল্পনায় বিভাগীয়, জেলাওয়ারী থানাওয়ারী, গ্রামকেন্দ্রিক পরিকল্পনার প্রস্তাবনা, বিভিন্ন লক্ষ্য, সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার বিষয়ে উল্লেখ থাকে।

বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায় কোন বিভাগ বা জেলা কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে থাকে। বিভিন্ন বিভাগ, জেলা, অঞ্চল প্রভৃতির বিভিন্ন সংস্থার প্রণীত পরিকল্পনাগুলো জাতীয় পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হয়। জাতীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে এসব পরিকল্পনা বিবেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা নামে অভিহিত।

কেন্দ্রীভূত ও বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনাকে অনেক সময় মাইক্রো (Micro) এবং ম্যাক্রো (Macro) পরিকল্পনার সাথে এক করে দেখা হয়। কিন্তু এটি সঠিক নয়।

মাইক্রো পরিকল্পনা

মাইক্রো পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এটির পরিকল্পনা ইউনিট যা এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে যার নিচে পরিকল্পনার আর কোন টিকে থাকার মত ইউনিট (Viable Unit) গঠন করা যায় না। অর্থাৎ এটি হলো টিকে থাকার মতো সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ইউনিট। যেমন– বাংলাদেশের প্রশাসনিক ক্ষুত্র ইউনিট হলো গ্রাম। এই গ্রাম পরিকল্পনার জন্য প্রতিটি গ্রামের সম্পদের পরিমাণ ও তার চাহিদা নির্দিষ্ট করে জানতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি গৃহস্থালির (Households) সার্ভে নিশ্চিত করতে হবে মাইক্রো পরিকল্পনা কাঠামো থেকে। শুধুমাত্র এটি সম্ভব হলেই সত্যিকারের মাইক্রো লেভেল পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু গ্রামে পরিকল্পনা প্রণয়নে কিছু সমস্যাও মোকাবেলা করতে হয়।

প্রথমত: অবস্থানগত ও সম্পদের প্রাপ্যতার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় বাংলাদেশের অনেক গ্রামই অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকার মতো পরিকল্পনা ইউনিট হতে পারে না। গ্রামগুলোর নিজস্ব চাহিদা মেটানোর জন্য গ্রামের বাইরের সম্পদের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বস্ত্র ইত্যাদির চাহিদা পূরণে একটি গ্রামের অর্থনৈতিক বিষয়টি আশে-পাশের গ্রামগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হয়।

দ্বিতীয়ত: মাইক্রো পরিকল্পনায় উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন যা গ্রাম পর্যায়ের বিদ্যমান পরিস্থিতি অনুযায়ী গ্রাম প্রশাসন কর্তৃক নিয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই তত্ত্ব ও ব্যবহারিক পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার সামান্যতম নির্ণায়ক (Minimum Criteria) পরিপূর্ণ করতে সক্ষম নয়। এমন কি ইউনিয়নকেও এর বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই গ্রামকে মাইক্রো পরিকল্পনার একক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। অবশ্য সরকারি পরিকল্পনাগুলোর জনস্বার্থে প্রচারে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে কিছুটা সক্ষম।

এক্ষেত্রে উপজেলা বা জেলা পরিষদকে পরিকল্পনার একক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিত দেখা যায় যে, জেলা পরিষদের হাতে তুলনামূলকভাবে বিশেষজ্ঞ এবং বেশি সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভারতে জেলা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় নাই। সাধারণত মাইক্রো পরিকল্পনা স্থানীয় সুনির্দিষ্ট চাহিদা, যোগান, এসব কিছুর সমস্যা প্রভৃতিকে নিরুপণ করে এবং বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থানীয় সম্পদের সাহায্যে হয়ে থাকে। এতে স্থানীয় সমাজের ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করা হয়।

বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে মাইক্রো পরিকল্পনার জন্য উপজেলা বা জেলা পর্যায়কে বিবেচনা করা যেতে পারে। সরকার কর্তৃক প্রণীত কর্মসূচিগুলো সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ একত্রীকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। যেহেতু বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মাইক্রো পরিকল্পনার কোন ধারণা এযাবৎ সৃষ্টি হয়নি সেহেতু কি ধরনের প্রশাসনিক ইউনিটে মাইক্রো পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে সে বিষয়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজ বিজ্ঞানীদের যৌথ গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ম্যাক্রো পরিকল্পনা

কেন্দ্রীভূত (Centralized) এবং বিকেন্দ্রীভূত (Decentralized) পরিকল্পনাকে প্রায়ই ম্যাক্রো (Macro) পরিকল্পনার সাথে মিলিয়ে এক করে দেখা হয়। কিন্তু এটি সঠিক নয়।

ম্যাক্রো পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল ক্ষেত্রের আয় ব্যয়ের খতিয়ান, প্রবৃদ্ধি, বাজেট, দারিদ্র্য হ্রাসকরণের কৌশল, সরকারি সম্পদের হিসাব নিকাশ অন্তর্ভূক্ত। অর্থনীতির যে সব প্রধান দিক রয়েছে এবং

দারিদ্র্য সম্পর্কিত যেসব খাত উপখাত (যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জনসংখ্যা, পরিবেশ, মানবসম্পদ উন্নয়ন) রয়েছে সেসব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হলো ম্যাক্রো পরিকল্পনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করলে–
ক. আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়
খ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়
গ. শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়
ঘ. দক্ষ শিক্ষক পাওয়া যায়

২. কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা হয়–
ক. গ্রাম পর্যায়ে
খ. থানা পর্যায়ে
গ. জেলা পর্যায়ে
ঘ. জাতীয় পর্যায়ে

৩. কোন দেশের শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মাইক্রো পরিকল্পনার ধারণা অনুসরণ করা হয়নি?
ক. বৃটেন
খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ. বাংলাদেশ
ঘ. জাপান

উত্তরমালা: ১.খ, ২.ঘ, ৩.গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিন।
২. বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা কি?
৩. আঞ্চলিক শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্ব কি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনার কৌশল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।
২. মাইক্রো পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ- ৪.৩: কৌশল: কার্যকরী দৃষ্টিকোন (Operational Perspective) থেকে বিষয়বস্তুর গভীরতা নির্ণয় মাধ্যম, প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিষয়বস্তুর গভীরতা নির্ণয় মাধ্যম বা কৌশল কি তা বলতে পারবেন।
- কৌশলগত মান নির্ধারনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শিক্ষা কৌশল কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানব সম্পদ পরিকল্পনা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শাব্দিক অর্থে বিষয়বস্তুর গভীরতা নির্ণয় মাধ্যম বা কৌশল হলো দক্ষতা, কুশলতা বা নিপুনতা। কিন্তু তত্ত্বগত দিক থেকে এর অর্থ কোন কাজ সুনিপুনভাবে সমাপ্ত করার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব গ্রহণের কৌশল। যে কোন কর্মসূচির সফল প্রয়োগের জন্য কৌশল প্রণয়ন একটি পূর্বশর্ত। কৌশল প্রণয়ন ও এর কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমসাময়িক প্রেক্ষাপট, এর সংক্ষিপ্তসার, উদ্দেশ্যের সমন্বয়, যৌক্তিক ব্যাখ্যা, নীতিগত আস্থা ও বিশ্লেষণাত্বক দিক নিদের্শনা থাকে। এছাড়া কৌশলে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সামর্থ্য ও কাঙ্খিত অর্জনের বর্ণনা থাকে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইভরি (IVORY)-তে অবস্থানগত কৌশল গ্রহণের চারটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো–

- আয়তন (Volume)
- বৈচিত্র্য (Variety)
- বিভিন্নতা (Variation)
- বাহ্যিক আরোপিত (Visibility)

অবস্থানগত কৌশল গ্রহণের প্রক্রিয়া

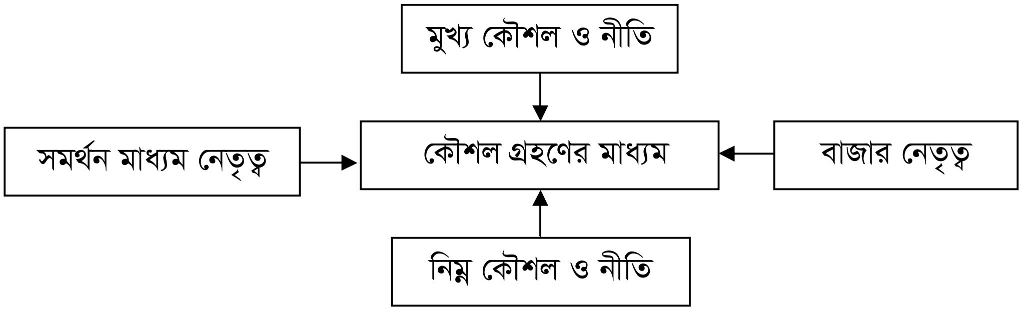

চিত্র: অবস্থানগত কৌশল গ্রহণের প্রক্রিয়া

মুখ্য কৌশল ও নীতি

আসল উদ্দেশ্যে গমনের জন্য যে নীতি ও কৌশল অবলম্বন করা হয়। যেমন– বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য অধিক পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা।

বাজার নেতৃত্ব

ভবিষ্যতের চাহিদা নিরূপন এবং পরিবর্তনশীল চাহিদা নির্ধারণে ব্যবস্থা গ্রহণের কৌশল। যেমন– শিক্ষকদের ল্যাপটপ ক্রয়ে ঋণ প্রদান।

নিম্ন কৌশল ও নীতি

ক্রমবর্ধমান চাহিদায় কৌশল অবলম্বন। আবার চাহিদা কমে গেলে টিকে থাকার নীতি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। যেমন- অনলাইনে বই পড়ার ব্যবস্থা থাকলেও বই কিনে পড়ার আগ্রহ তৈরি করা।

সমর্থন মাধ্যম নেতৃত্ব

সঠিক ও সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগের জন্য গৃহীত কৌশল ও নীতি। যেমন– গবেষণামূলক কর্ম।

শিক্ষাগত কৌশলসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পঠন-পাঠন কৌশল, শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণি, মেধা অনুযায়ী শিক্ষা সহায়ক কৌশল অবলম্বন করা হলো শিক্ষাগত কৌশল। Innovatemyshool.com এক শিক্ষা কৌশল সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Teaching strategies refer to methods used to help students learn the desired course contents and be able to develop achievable goals in the future.Teaching strategies identify the different available learning methods to enable them to develop the right strategy to deal with the target group identified".

অন্য কথায় বলা যায়, শিক্ষাগত কৌশল অবলম্বন হল শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে উন্নতকরণের প্রতিনিধিত্ব করা। শিক্ষাগত কৌশলের মধ্যে রয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতির শিক্ষাক্রম, মূল্যায়নভিত্তিক রুটিন, আর্থিক ব্যাপার ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষক কর্তৃক গৃহীত শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ দ্বারা শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া সচল কিনা, বিভিন্ন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকের পাঠদান ভিত্তিক কৌশলগত এর অন্তর্ভুক্ত।

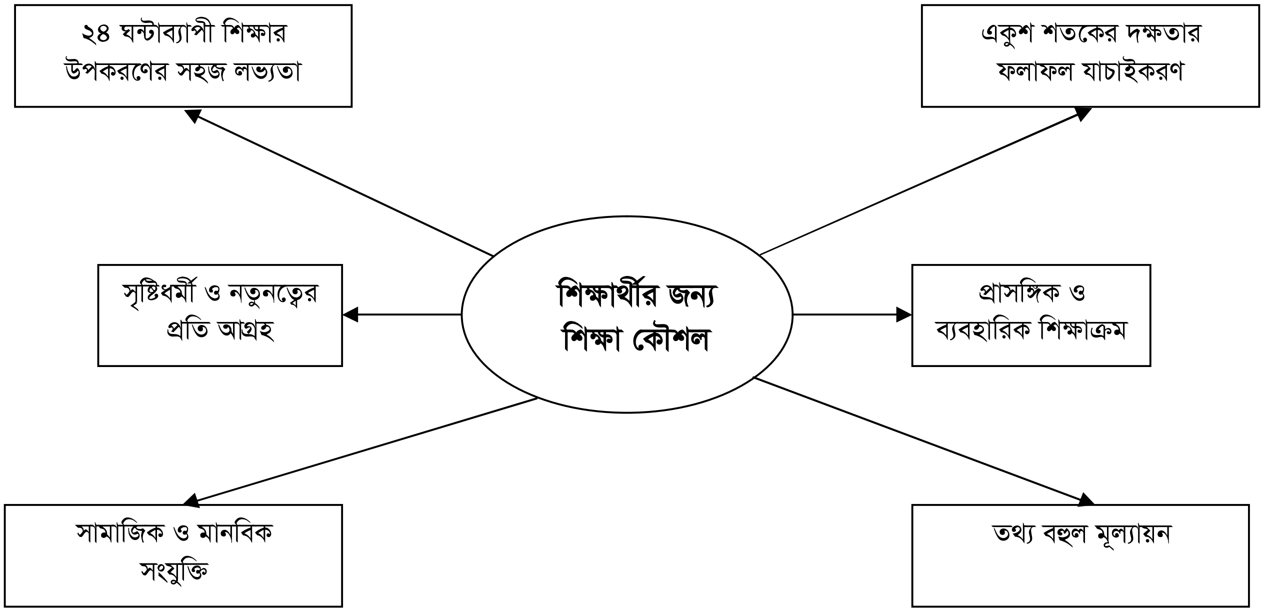

শিক্ষার্থীর শিক্ষা কৌশল (তথ্য সূত্র:)

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে এর জনবল, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং বিদ্যমান সম্পদের যুগপৎ শক্তি ও যোগানের আন্তঃক্রিয়াজাত একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া। M. B. Buch প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Institutional planning is a programme of development and improvement prepared by an educational institution on the basis of its felt needs and the resources available or likely to be available, with a view to improving the school programme and school practices. It is based on the optimum utilization of the resources available in the school and community". (Source:- Yourarticlelibrary)

লক্ষ্য ও ধরন

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলোতে ঐক্য থাকা প্রয়োজন। এগুলো হলো–

- স্বল্প মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী উভয়ই হতে পারে;
- অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনাগুলোতে সমন্বয় থাকবে;
- প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ছোট বড় হতে পারে;
- অন্তর্ভুক্ত সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অব্যাহত উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার ধরণ তিনটি। এগুলো হলো–

- প্রায়োগিক;
- কৌশলগত;
- সময়ভিত্তিক।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

- জাতীয় মানব সম্পদের যোগান ও ক্রমবর্ধমান চাহিদার ঘাটতি পূরণ করা;
- প্রাথমিক যুগে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকে সময়ের সাথে সাথে যুগোপযোগী করা;
- সমাজের আর্থিক উন্নয়ন সাধন;
- মানব সম্পদ উন্নয়নে বিরাজমান উৎসের সমন্বয় করা;
- দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা;
- প্রতিষ্ঠানের কাজের মূল্যায়ন করা।

মানব সম্পদ পরিকল্পনা

উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবসম্পদের বা মানব শক্তির ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন দেশের অতীত অভিজ্ঞতা হতে বর্তমানে এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সুপরিকল্পিত শিক্ষাই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি সাহায্য করতে পারে। হিউম্যান রিসোর্স ডিকশনারিতে মানবসম্পদ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Manpower Planning is the process of estimating or projecting the number of personnel required for a project (with different skill sets) over a predefined period of time. Manpower strategic planning scenario planning or contingency planning".

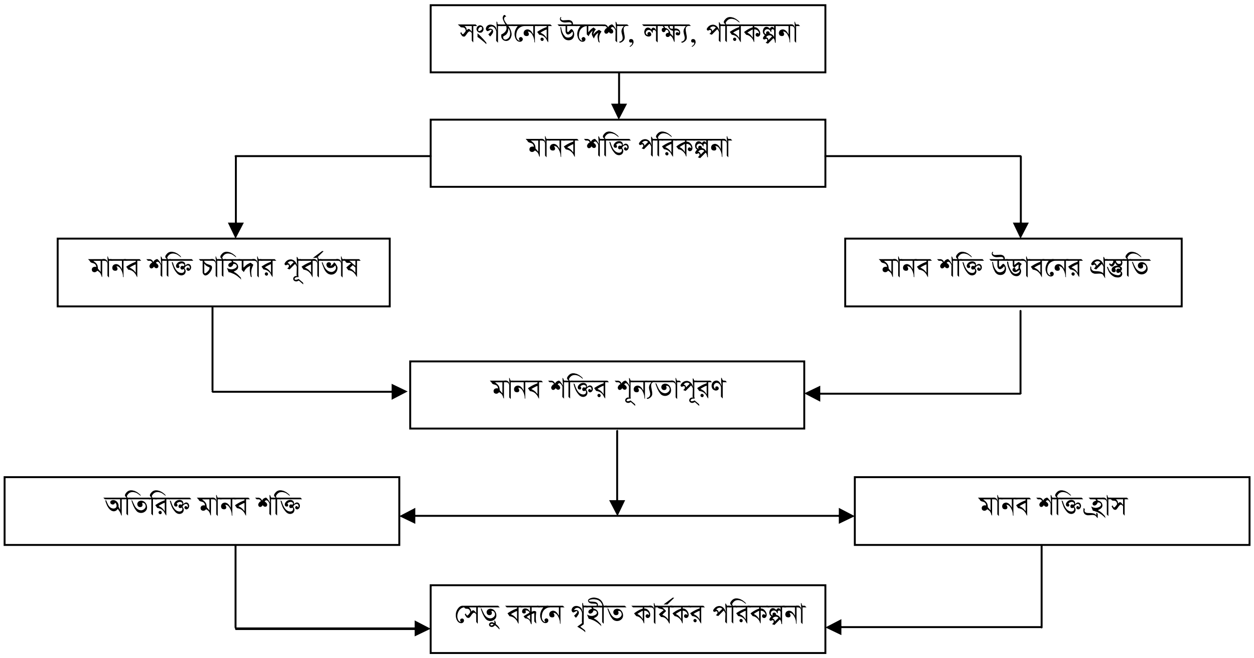

চিত্র: মানব শক্তি পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

মানবসম্পদ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

পূর্বেই বলা হয়েছে সুপরিকল্পিত শিক্ষাই উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি সাহায্য করতে পারে। আর এই শিক্ষা হতে হবে প্রাথমিক স্তর হতে। কারণ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কোন কোন দেশে উচ্চ শিক্ষার স্তরের তুলনায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার অবদান বেশি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কোন দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে শিক্ষার সহ-সম্পর্ক (Correlation) যেমন রয়েছে তেমনি মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্কও জড়িত রয়েছে। তাই পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের সম্পর্ক ও জড়িত রয়েছে। তাই পরিকল্পিতভাবে সাক্ষরতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে চালিত করা যায়। বিভিন্ন দেশের মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি তুলনা করলে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনুধাবন সহজ হবে।

ভারত

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য এম. এম. আনসারী ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮১ সালের দশকওয়ারী পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে,... "For raising per capita income, literacy programmes should be given a reasonably high priority". তিনি ভারতের ১৭টি রাজ্যের দুই বছরের (১৯৭৮, ১৯৮১) পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, "নিরক্ষর ও দরিদ্রতা একই দিকে ধাবিত হয় এবং একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে। কারণ যে সব অঞ্চলে অধিক সংখ্যক নিরক্ষর রয়েছে, সেখানে দরিদ্রতার নিবিড়তা বেশি"। তাই এটা প্রমাণিত যে, দরিদ্রতা দূরীকরণ এবং আয় বিতরনে শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য।

ইউরোপিয় বিভিন্ন রাষ্ট্র

মোট জনসম্পদের সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে দেশের উন্নয়ন চলমান হয়। সাক্ষরতার সর্বোচ্চ হার আমরা প্রায়ই দেখি শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলোর জনসংখ্যার মাঝে। অধিকাংশ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে সাক্ষরতার হার সর্বোচ্চ এবং তাদের জাতীয় মাথাপিছু আয়ও অন্যান্য দেশেল তুলনায় অগ্রগামী। নিম্নের সারণীতে তা প্রমাণিত।

রাষ্ট্র	সাক্ষরতার হার	মাথাপিছু জাতীয় আয়
যুক্তরাজ্য	৯৯%	৩৪,৮০০ মার্কিন ডলার
ফ্রান্স	৯৯%	৩৩,১০০ মার্কিন ডলার
জার্মানি	৯৯%	৩৫,৭০০ মার্কিন ডলার
ইতালি	৯৯%	৩০,৫০০ মার্কিন ডলার

জাপান

১৮৬৮ সালে জাপানে সামন্তবাদের অবসান হয়। তখন থেকে জাপানের জাতীয়তাবাদী নেতারা সর্বজনীন ও পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৮৮৫ সালে জাপান যখন শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা আরম্ভ করে তখন তাদের মোট শিক্ষা ব্যয়ের ৮৪% ভাগ ৬ বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয় করেছিল। জাপানে ১৯৩০ সাল থেকে জাতীয় আয়ের ২৫% বৃদ্ধি ঘটেছিল। ১৯৬৩ সালে জাপান শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত 'জাপানের বিকাশ ও শিক্ষা' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে "এদেশে শিক্ষার একটি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সমগ্র জনসমাজের দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটানো। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা উপযুক্ত সামাজিক অগ্রগতি কোনটাই সমাজের শুধু সীমাবদ্ধ অংশের অগ্রগতি থেকে বা গুটি কয়েক দক্ষ ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সম্ভব হতে পারে না"। এই মন্তব্য দ্বারা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তার পরিকল্পিত বিস্তারের প্রতি গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক চমৎকার উন্নয়নের প্রতিফলন দেখা যায় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ তাঁদের পরিকল্পিত সাম্যবাদী সমাজ গঠনের হাতিয়ার রূপে শিক্ষাকে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সময় রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগই ছিল নিরক্ষর। রুশ বিপ্লবের মহান নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন বিশ্বাস করতেন, "শিক্ষা হবে সাম্যবাদের পথে সমাজকে এগিয়ে নেয়ার একটা হাতিয়ার"। লেনিন পরবর্তী নেতা জোসেফ স্ট্যালিন এবং মিখাইল ক্রুশ্চেভও লেনিনের বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২০ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মোট ৯ কোটি ৬০ লক্ষ নিরক্ষর, স্বল্প নিরক্ষর বয়স্ক মানুষকে শিক্ষাদান করা হয়। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিন কোটি ৯ লক্ষ ছেলে মেয়ে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করে।

১৯২৪ সালে সোভিয়েত সরকার প্রাথমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এতে প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয় ১৬২.২ কোটি রুবল। এ পরিকল্পনা দশ বছরে ছাত্র সংখ্যা ৪০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৮০ লক্ষতে উন্নীত করার টার্গেট স্থির করা হয়। শিক্ষা প্রাপ্ত এসব শিক্ষার্থী রাষ্ট্রের উৎপাদনযন্ত্রে অংশীভূত হবার ফলে মাত্রা পাঁচ বছরে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ হয় ২০০ কোটি রুবলের বেশি। এতে করে প্রাক্কলিত ব্যয় পুরোপুরি ব্যবহার করে আয় উদ্বৃত্ত করার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারিত হয়।

সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ ভি. ই. কোমারভ (V. E. Komarov) ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সালের শিক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে, এ সময়ের মধ্যে শ্রমশক্তি বৃদ্ধির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় আয় ২৩% ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় ৭৭% ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি প্রাপ্ত

৭৭% জন উৎপাদনশীলতার মধ্যে ৩৮% ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর বৃদ্ধির ফলে এবং ৩৯% ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে শ্রমিকদের মাঝে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ জনিত কারণে।

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি ও শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য শিল্পের যথোপযুক্ত উন্নয়ন করা জরুরি। কারণ কৃষির উৎপাদন ও উন্নয়নে উন্নতমানের সংরক্ষিত বীজ, প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের সার, কীটনাশক, কৃষিজ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন রয়েছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এসবের শিল্পখাত তৈরি করতে না পারলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। এছাড়া পশ্চাৎপদ কৃষিখাত ও শিল্প উন্নয়নে বিরূপ ভূমিকা রাখে। কারণ কৃষিখাত থেকেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্য শস্যের যোগান আসে। দেখা যায় কোন কোন উন্নয়নশীল রাষ্ট্র শিল্পখাতের তুলনায় কৃষিখাতের উন্নয়নে কম মনোযোগ দেয়। ফলে কৃষি খাতের অনুন্নয়নের ফলে শিল্পখাতও অনুন্নত থেকে যায়। তাই একমাত্র পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে এ থেকে উত্তরণ লাভ করা সম্ভব।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পরই তাই শিক্ষাখাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টিকেও প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ দেশের জনসংখ্যার অর্ধেককে শিক্ষার বাইরে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, নিজকে ক্ষমতায়িত করার জন্য যতগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন প্রত্যেকটিই নারী অর্জন করতে পারে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। নারীর উৎপাদনশীলতা তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা এমনকি তাদের মানসিক অবস্থার উন্নয়নের উপরও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এমন কি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণেও তার ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। কারণ উৎপাদনশীলতার সাথে সংযুক্ত একজন নারী কখনই অধিক সন্তানের জন্ম দিতে আগ্রহী হয় না। ফলে দেশের জনসংখ্যার অপরিকল্পিত বৃদ্ধির হার কম হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান, সাতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-২০১৯), ১৯৭৪ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৮ সালের অন্তবর্তী শিক্ষানীতি, ১৯৭৮ সালের নয়া শিক্ষানীতি, ১৯৮৩ সালের ড. আবদুল মজিদ খানের শিক্ষা প্রতিবেদন, ১৯৮৮ সালের মফিজউদ্দিন আহমদের শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন, ১৯৯৭ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন, ১৯৯৭ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০০০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০০৩ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন, ২০০৩ সালের দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র, ২০০৪ ও ২০০৮ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১১ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১২ সালের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১৩ সালের শিক্ষা আইন, সব কয়টি জাতীয় নীতিতে নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়। তবে এই আশা তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানো সম্ভব হবে। সরকার যত নীতি, পরিকল্পনা, প্রকল্প গ্রহণ করুন না কেন এসব বাস্তবায়নের অর্থের প্রবাহমানতা বজায় থাকা আবশ্যিক বিষয়। বিশেষ করে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের সুফল তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ না করা গেলেও এর সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ফলাফল বিলম্বে পাওয়া যায়। যা রাষ্ট্রের মানবসম্পদ গঠনে কার্যকর স্থায়ী সুফল বয়ে আনে। কেননা শিক্ষা খাতে এক ডলার ব্যয় করলে বিশ বছর পর তার পনেরোগুণ ফল ফেরত পাওয়া যায়। বাজেটে শিক্ষা খাতে ভালো বরাদ্দ দেশের মোট জাতীয় আয়ের ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. “যে সব অঞ্চলে অধিক সংখ্যক নিরক্ষর রয়েছে, সেখানে দরিদ্রতার নিবিড়তা বেশি”। কার উক্তি?
ক. এম. এম. আনসারী
খ. ভ. ই. লেনিন
গ. কৈলাস সত্যার্থী
ঘ. ভি. ই কোসারভ

২. রুশ বিপ্লবের সময় মোট জনসংখ্যার কত ভাগ নিরক্ষর ছিল?
ক. ৭০% ভাগ
খ. ৭৫% ভাগ
গ. ৯০% ভাগ
ঘ. ৮৫% ভাগ

৩. বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের নাম কি?
ক. খুদা কমিশন
খ. মফিউদ্দিন কমিশন
গ. বারী কমিশন
ঘ. সাদেক কমিশন

৪. শিক্ষা খাতে এক ডলার ব্যয় করলে বিশ বছর পর কতগুণ ফল ফেরত পাওয়া যায়?
ক. ১০ গুণ
খ. ১৫ গুণ
গ. ১২ গুণ
ঘ. ২০ গুণ

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. ক, ৪. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মানুষের সাক্ষরতার সাথে আয় বৃদ্ধির কি সম্পর্ক রয়েছে?
২. নারী শিক্ষার সাথে দরিদ্রতা ও জন্ম হারের সম্পর্ক কি?
৩. পশ্চাৎপদ কৃষি ও শিল্পের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা কি? প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
২. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।
৩. উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পিত শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৪.৪: শিক্ষা পরিকল্পনার বিভিন্ন পন্থা– সামাজিক, মানবসম্পদগত, বিনিয়োগ ফেরত, সিস্টেমপন্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে জনশক্তি তৈরির বিষয়টি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা তৈরির বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষায় বিনিয়োগের সুফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার ধারাবাহিকতার মাধ্যমে সুসংবদ্ধ জাতি গঠনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সামাজিক সচেতনতায় শিক্ষা পরিকল্পনার বিভিন্ন পন্থা

যে কোন দেশের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় যে দেশের জাতীয় উন্নয়নকে কেন্দ্র করে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবিক উন্নয়নের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন নির্ধারিত হয়। আর জাতীয় উন্নয়নের মূলভিত্তি হল শিক্ষা। শিক্ষা জাতীয় জীবনকে উচ্চতর মানের দিকে ধাবিত করে।

জাতীয় উন্নয়ন একটি গতিশীল ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সাথর্ক করতে হলে সাধারণ নাগরিকের জন্য মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সৃজনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সমাজে ক্ষুধা, দারিদ্র, অজ্ঞতা, কুসংস্কার বিরাজমান থাকলে সামাজিক পরিপূর্ণ নাগরিক তৈরি হয় না। তাই সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী সবারই ভূমিকা রয়েছে। তাদের বুঝতে হবে শিক্ষার অগ্রগতি অনেকাংশে সুশৃঙ্খল পন্থার উপর নির্ভর করে। বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতামূলক সমাজে মানুষ যে অভ্যাস, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও সচেতনতা নিয়ে কর্মমুখী জীবনে প্রবেশ করে তা মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা, সামাজিক উন্নয়ন, মানবিক মূল্যাবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সত্তরের দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সামাজিক বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হতো। তাই সামাজিক চাহিদাকে টার্গেট করে তখন শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হতো। এটিকে সামাজিক চাহিদা পন্থা (Social Demand Approach) নামে অভিহিত করা হয়।

সামাজিক চাহিদা পন্থায় শিক্ষা পরিকল্পনাবিদকে দেশের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। তাঁকে পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে জানা যেমন প্রয়োজন তেমনি সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পন্থা (Approach) জানাও জরুরি। এছাড়া শিক্ষা সম্পর্কিত চলক ও সূচকগুলো সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যেমন– যদি দেশের সকল শিশুকে বিদ্যালয়গামী করতে হয় তবে নতুন করে অবকাঠামোগত নির্মাণকে অধিক সংখ্যক পরিমানে বৃদ্ধি করতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনাবিদকে প্রতিষ্ঠান ম্যাপিং সম্পর্কে জানতে হবে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠান ম্যাপিংয়ে অন্তর্ভুক্ত।

- জনসংখ্যা সংক্রান্ত উপাদান;
- ভৌগোলিকপরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য;
- সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষা সম্পর্কিত উপাদান;
- সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত তথ্য;

- সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজনৈতিক পরিবেশ;
- সংশ্লিষ্ট এলাকার মানব সম্পর্কিত উপাদান।

মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক পন্থা

শিক্ষা পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক শক্তিতে মানবসম্পদের চাহিদা নিরূপন করা এবং চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনশক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করা। আর মানবসম্পদ উন্নয়নের যেসব কৌশল রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ করা। শিক্ষাই মানুষকে সে লক্ষ্য পূরণে সর্বাপেক্ষা অধিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়ে থাকে। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন ধরনের লাগসই, টেকসই কৌশল ও পন্থা (Approach) অনুসরণ করা অপরিহার্য।

বিশ্বের বহু দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা পরিকল্পনা সবসময় একই রকমের হবে বা পূর্ববর্তী ধারা অব্যাহত থাকবে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। দেখা যায় এসব দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন সরকারের যে কোন নীতিই পরবর্তী সরকারের অনুসরণের দৃষ্টান্ত তেমন দেখা যায় না। কেননা বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি সরকারই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনার যৌক্তিকতা, নিশ্চয়তা, অনিশ্চয়তা, বাস্তবায়নে ঝুঁকি, কার্যকরণে অনভিজ্ঞতাহেতু পূর্ববর্তী সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনাগ্রহী হয়ে থাকে। আবার অর্থনৈতিক বাস্তবতার জন্যও শিক্ষা পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হয়। এছাড়া সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাঙ্গনে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটে। যা সমসাময়িক এবং অদূরভবিষ্যতে মানবসম্পদ উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রাখে। এ দিকটি বিবেচনা করে তাই শিক্ষা পরিকল্পনার পন্থা বা এ্যপ্রোচ সময় সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। বিগত শতকের ষাটের দশকের শিক্ষা পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মানবসম্পদ উন্নয়ন। কেননা মানবসম্পদ উন্নয়নের উপরই জাতীয় উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই তখনকার দিনে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয় পন্থা (Manpower Requirement Approach)-ই ছিল শিক্ষা পরিকল্পনার মূল দিক নির্দেশনা। বর্তমান শতকেও এই ধারা অব্যাহত আছে। তবে শিক্ষার মানবসম্পদ উন্নয়নের পন্থাকে আরো যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী করা হয়েছে।

২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে তাই বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে, “দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষজনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ও অসম-প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মযার্দাবৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং তথ্য প্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে”।

তাই বর্তমানে দেখা যায় গ্রামে কৃষি থেকে শুরু করে পাওয়ার টিলার, আখ-ধান-গম মাড়াইয়ের মেশিন, রাইস মিল, পাওয়ার লুম, যন্ত্রচালিত তাঁত, যান্ত্রিক নৌকা, সৌর বিদ্যুৎতায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। এসব উন্নতি ছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি (ICT)-র ব্যাপক সম্প্রসারণ হচ্ছে।

দক্ষ জনশক্তিতে নারীর সম্পৃক্তকরণ

যে কোন দেশের প্রায় অর্ধেক বা অর্ধেক জনগোষ্ঠী হলো নারী। এই নারীদের দক্ষ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নারীদের শিক্ষিত করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে বাংলাদেশে গৃহীত প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)-য় নারীর সাক্ষরতার বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হয়। ১৯৭৩ সালে যখন পরিকল্পনা কমিশন গ্রহণ করা হয় তখন এদেশে নারী শিক্ষার্থীর হার ছিল শতকরা ২৮.৫ ভাগ। আর জেনেভাভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের 'বিশ্ব লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদন ২০১৪'-তে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের সূচকে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল শীর্ষে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনায় নারী শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। এসব পরিকল্পনায় যে সব বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল সেগুলো হলো−

- শিক্ষা চলাকালীন বাল্য বিবাহে নিরুৎসাহীতকরণ;
- ক্ষেত্র বিশেষে, মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা নির্ধারিত থাকা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা নির্ধারিত থাকা;
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা হোস্টেল সুবিধা চালু;
- বৃত্তি, উপবৃত্তির ব্যবস্থা;
- পোশাকসহ শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কন্যা শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র টয়লেট সুবিধা;
- মহিলা পলিটেকনিক চালু;
- অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% নারী শিক্ষা নিয়োগ প্রদান;
- কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল স্থাপন;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন;
- খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমে নারীর শিক্ষা ইতিবাচক দিক তুলে ধরা ইত্যাদি।

দেশের জনগণের মধ্যে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও একেবারে কম নয়। এদের মানবসম্পদে রূপান্তর করা না গেলে সমাজের, দেশের বোঝা (Burden) হিসেবে পরিগণিত হয়। আবার শহর ও গ্রামের মানুষের মধ্যেও শিক্ষার সুযোগ সমান নয়। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চল, হাওড় অঞ্চল, দুর্গম চরাঞ্চলেও শিক্ষার সমান সুযোগ থাকে না। আবার হিন্দু ধর্মের জনগোষ্ঠী বিশেষত তফসিল সম্পদায়ভুক্তরা (Schedule Castes) শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। শিক্ষা পরিকল্পনায় এদের শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

সমাজে বিকলাঙ্গ ও অটিস্টিক শিশুদের পরিবার ও দেশের বোঝা হিসেবে চিহ্নিত না করে তাদের জন্যও পৃথক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এতে করে জন সম্পদের চাহিদা নিরূপন ও তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন গতিশীল থাকে।

শিক্ষায় বিনিয়োগ পন্থা

১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে T. W. Shultz-এর মত অর্থনীতিবিদগণ শিক্ষা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মানব চাহিদার মৌলিক উপাদানকে ভোগ নয় বরং বিনিয়োগরূপে গণ্য করা উচিত বলে নীতি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই দেখা যায় সে সময় থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থায়ন বিনিয়োগ অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মত যে সমশক্তি সম্পন্ন তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের সরকার শিক্ষা ও জনসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির পক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে শুরু করে। তখন থেকেই শিক্ষা ব্যয়বহুল সমাজসেবামূলক কাজ নয় বরং ভবিষ্যৎ সম্পদ সৃষ্টি ও সম্পদ বৃদ্ধির উপায়রূপে গণ্য হতে থাকে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো ষাটের দশকে শিক্ষায় সরকারি ব্যয় করত জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ থেকে ৮ ভাগের মধ্যে। স্বাধীনতার অব্যাবহিত পরেই ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল জাতীয় আয়ের মাত্র ১:৮ ভাগ। ১৯৬২ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রিদের এক সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৪ ভাগ থেকে ৫ ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয়ের আদর্শিকরূপ হিসেবে বিবেচনা করে।

দেশের দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে হলে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয়ের কত অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন তার সর্বজনস্বীকৃত কোন পরিমান নেই। তবে প্রয়োজনীয় জনসম্পদ নির্ধারন পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। এই পদ্ধতিতে দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য বিভিন্ন ধরনের যে সব দক্ষতার প্রয়োজন তাকে নীতি নির্ণয়কল্পে ব্যবহার করা হয়। তবে অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্যও যাতে পূর্ণতা পায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রয়োজনীয় জনশক্তি সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ পূর্বমানের উপর নির্ভর করে পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। যদিও জনশক্তি সম্পর্কে এই পূর্বানুমান পরিপূর্ণ সঠিক এবং সুবিন্যস্তভাবে করা অসম্ভব তথাপি এই পূর্বানুমান যত বিস্তারিত হবে, শিক্ষা পরিকল্পনাও তত বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

শিক্ষা পরিকল্পনার সুসঙ্গবদ্ধ কৌশল পদ্ধতি

শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য আনয়নের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে সমাজের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এসব তথ্যাদির মধ্যে রয়েছে–

- দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা;
- মানবসম্পদের দক্ষতার স্তর;
- জাতীয় উন্নয়নের সাথে সঙ্গতির মাত্রা;
- মোট জাতীয় বাজেটের নির্ধারিত অংশ ব্যয়;
- শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কিত দূরদর্শিতা;
- শিক্ষা খাতে প্রাপ্ত অর্থের সর্বাধিক ব্যবহার।

উপরোক্ত তথ্যাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে শিক্ষা পরিকল্পনার সিস্টেম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা প্রকল্পে প্রয়োজনীয় ভৌত ও বৌদ্ধিক বিনিয়োগের ব্যবস্থা কাঙ্খিত লক্ষ্যার্জনে সহায়তা দিয়ে থাকে। শিক্ষা প্রকল্পের ভৌত বিনিয়োগের জন্য পরিকল্পনাবিদদের স্কুল ম্যাপিং সম্পর্কে অবগত হতে হয়। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ শৈলী ও নির্মাণ ব্যয় সম্পর্কে বিবেচনা করতে হয়। এছাড়া আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হয়। এছাড়া জাতীয় বিশেষজ্ঞকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহযোগিতাও গ্রহণ করতে হয়।

শিক্ষা পরিকল্পনাবিদগণ শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারিত হবার পর দেশে বিরাজমান শিক্ষা ব্যবস্থার কোথায় দুর্বলতা আছে, কোন দিকটি অধিক কার্যকর, কোন বিষয়ে নতুন তথ্য সংযুক্তির প্রয়োজন তা চিহ্নিত করেন। এটি

অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জটিল প্রক্রিয়া। সঠিকভাবে এটি করা অসম্ভব হলে পরিকল্পনা সাফল্য বয়ে আনে না। অর্থ, শক্তি ও সময়ের অপচয় ঘটে। অবস্থা নিরূপনে তাই শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সহায়ক কর্মকর্তা, শিক্ষক, রাষ্ট্রীয় বুদ্ধিজীবীর সাহায্য নেয়। এতে কতগুলো সূচক ব্যবহার করা হয়। সূচকগুলো হলো শিক্ষার্থী ভর্তির হার, ঝরে পড়ার হার, উত্তীর্ণ অনুত্তীর্ণ হার, শিক্ষা ক্ষেত্রে আর্থিক অপচয় ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগারের প্রাপ্যতা, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার মান ইত্যাদিরও বিবেচনা করা হয়। এছাড়া পরিকল্পনা বাধ্যবায়নে সম্ভাব্য বাধার কথাটিও বিবেচনায় রাখতে হয়।

যে কোন পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে তার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের উপর। দেশ ও জাতির মঙ্গলার্থে কোন ক্ষেত্রগুলোকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন তা চিহ্নিত করে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। যেমন বাংলাদেশে বর্তমানে প্রয়োজন শতভাগ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন, ঝড়ে পড়া রোধ, বিনামূল্যে বইপত্র সরবরাহ, ইংরেজিতে পঠন-পাঠন কার্যকর করা, জনগণকে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করা। এতগুলোর মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে তাই হলো চিহ্নিতকরণ। এছাড়া পরিকল্পনার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের পর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কি ধরনের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে তাও সুষ্ঠুভাবে চিহ্নিত করতে হবে। পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সাপেক্ষে নিরসন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ষাটের দশকের শিক্ষা পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল–
ক. কৃষি উন্নয়ন
খ. শিল্প উন্নয়ন
গ. প্রযুক্তি উন্নয়ন
ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়ন

২. বাংলাদেশের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার–
ক. ১৯৭১-১৯৭৫
খ. ১৯৭৩-১৯৭৮
গ. ১৯৭২-১৯৭৬
ঘ. ১৯৭৪-১৯৭৮

৩. ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে কন্যা শিশুর শিক্ষার হার ছিল–
ক. ২৮ ভাগ
খ. ৩০ ভাগ
গ. ২৮.৫ ভাগ
ঘ. ৩০.৫ ভাগ

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রতিষ্ঠান ম্যাপিং কি?
২. মানবসম্পদ উন্নয়ন পন্থা কি?
৩. সামাজিক চাহিদা পন্থা কি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দক্ষ জনশক্তিতে নারীর সম্পৃক্তকরণ বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষার বিনিয়োগ পন্থাটি বর্ণনা করুন।
৩. শিক্ষা পরিকল্পনায় সুসংসবদ্ধ কৌশল পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৪.৫: পেশাভিত্তিক শিখন সমাজ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পেশাভিত্তিক শিখন সমাজ কি তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন।
- পেশাভিত্তিক শিখন সমাজের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- পেশাভিত্তিক শিখন সমাজের প্রায়োগিক দক্ষতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯৯০ সালে পিটার সেঙ্গের (Peter Senge) *The Fifth Discipline* গ্রন্থটিতে প্রথমবারের মত পেশাভিত্তিক শিখন সমাজের ভাবনাটি প্রবচন (Phrase) আকারে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে আমেরিকান এডুকেশনাল রিসার্চ এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় চার্লস বি, মায়ার্স (Charles B. Myers) উপস্থাপিত "Beyond the PDS: Schools as Professional Learning Communities" শীর্ষক প্রবন্ধে পেশাজীবিতা উন্নয়ন শিক্ষা (Professional Development School)-র বিষয়টি বিশদভাবে সম্মুখে আনেন। পেশাজীবিকা শিক্ষা হলো নিজ নিজ পেশার নৈপুন্য বিকাশের প্রক্রিয়া। পেশাজীবিতা উন্নয়ন শিক্ষার দুইটি ক্ষেত্র রয়েছে। একটি হল পারিবারিকভাবে অর্জিত পেশার উন্নয়ন আর অন্যটি হল সম্পূর্ণ নতুন পেশার সাথে সংশ্লিষ্টতা। এই দু'টি দিক বিবেচনা করে পেশাজীবিতা উন্নয়ন শিক্ষার কোর্সসমূহ রূপায়ন করা হয়। এই শিক্ষার আওতায় নানাবিধ বৃত্তিমূলক শিক্ষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন শিক্ষা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা রয়েছে। এই শিক্ষার ফলে মানুষের নিজ নিজ পেশায় দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বিজ্ঞানমনস্ক হতেও সহায়তা করে।

পেশাদার শিখন সমাজের সংজ্ঞা

পেশাদার শিখন সমাজের সংজ্ঞার মধ্যে নানা ধরনের বৈচিত্র রয়েছে। Leading Professional Learning Communities: Voices From Research and Pratice গ্রন্থ প্রণেতা শার্লি এম.হর্ড (Shirley M. Hord) এবং উইলিয়াম এ সমারর্স (William M. Sommers) যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে বোঝায়, "Extending classroom practice into the community; bringing community personnel into the school to enhance the curriculum and learning tasks for students; or engaging students, teachers, and administrators simutancously in learning". অর্থাৎ তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন যে পেশাদার শিখন সমাজ শিক্ষক, শিক্ষার্থী উভয়ের অন্তর্মুখীতা দূর করে পেশাগতভাবে সক্রিয় করে তোলে। অধিক তথ্য এবং অনুসন্ধিৎসু মানসিক গঠনে সহায়তা করে।

রিচার্ড ডুফর (Richard Dufour) এবং রবার্ট ই. ইকার (Robet E. Eaker) পেশাদার শিখন সমাজের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো-"...requires the school staff to focus on learning rather than teaching, work collaboratively on mattersrelated to learning and hold itself accountable for the kind of results that fuel continual improvement".

মাইকেল ফুলান (Michael Fullan)বলেছেন, '... in the spread of PLCs, we have found that the team travels a lot faster than the concept, a finding common to all innovations. The concept is deep and requires careful and persistent attention in thorough learning by reflective doing and problem solving." ফুলান আরও বলেন, 'Transforming the culture of

schools and the systems within which they operate is the main point. It is not an invovation to be implemented, but rather a new culture to be developed.”

পেশাদার শিখন সমাজের গুরুত্ব

কর্মক্ষেত্রে সমপেশার একাধিক ব্যক্তি যখন আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে কোন কর্ম উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় তখন তা সাফল্যমন্ডিত হতে সহায়ক হয়। পারস্পরিক তথ্য ও জ্ঞান আদান প্রদানের মাধ্যমে অজানা বিষয় সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়। এছাড়া নিম্নোক্ত লক্ষ্যগুলো অর্জনে সহায়ক হয়।

- লক্ষ্য ও কাজের মূল্যায়ন তৈরিতে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে দিন দিন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- সক্রিয়ভাবে সমস্যা সমাধানের পথ তৈরি হয়। নতুন নতুন ভাবনার (Idea) জন্ম হয়।
- সম্মিলিত কাজ করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জন সহজ হয়।
- শিক্ষাক্ষেত্রে প্রায়োগিক ক্ষমতার সুযোগ তৈরি হয়।
- পেশাদারি দক্ষতা বর্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি পায়।
- যে কোন কর্মঝুঁকিতে আত্মপ্রত্যয়ী হবার দক্ষতা তৈরি হয়।

পেশাদার শিখন সমাজের প্রায়োগিক দক্ষতা

পেশাদার শিখন সমাজে উর্ধতন ও অধস্তনদের সঙ্গে নিয়ে বসে পরিস্থিতি, সম্পদ ও লোকবল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। সকলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত হয় বলে যথাসময়ে কর্ম-সম্পাদনার মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি প্রায় । সহজে কর্ম-সম্পাদিত হয়। আবার পেশাগত শিখনের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। অভিজ্ঞজনরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ভাবধারার বিস্তরন ঘটাতে পারেন। অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞজনরা জ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কাজের মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন। প্রয়োজন অনুযায়ী সকলে মিলে পূর্বের কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। এভাবে কম অভিজ্ঞ বেশি অভিজ্ঞজনরা একত্রে কাজ করেন বলে কর্মজীবন ও দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্ম-সম্পাদনে সময় স্বল্পতা তৈরি হয়। প্রাতিষ্ঠানিক খ্যাতি ও সুনাম বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত মজবুত হয় এবং মানসিকভাবে ইতিবাচক ভাবধারা তৈরি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পেশাভিত্তিক শিখন সম্প্রদায়ের প্রবচনটি কে ব্যবহার করেন?
ক. পিটার সেংগে
খ. চার্লস বি. মায়ার্স
গ. মাইকেল ফুলান
ঘ. রিচার্ড ডিফর

২. The Fitth Discipline গ্রন্থটি প্রথম কবে প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯৯০
খ. ১৯৯১
গ. ১৯৮৯
ঘ. ১৯৫৩

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পেশাদার শিখন সমাজের সংজ্ঞা দিন।
২. পেশাজীবীতা উন্নয়ন শিক্ষার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পেশাভিত্তিক শিখন সমাজের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. পেশাভিত্তিক শিখন সমাজের প্রায়োগিক দক্ষতা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৪.৬: অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির উন্নয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষায় অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকগুলো বলতে পারবেন।
- অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির প্রতিবন্ধকতা হতে উত্তরনের উপায় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পাররেন।

অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি

কোন কর্মতৎপরতায় সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সম্মিলিত পরিকল্পনার প্রয়াস হল অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি। কাঠামোগতভাবে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত করার জন্য জনঅংশীদারিত্বের সদিচ্ছামূলক প্রক্রিয়া হল অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি। উইকিপিডিয়ায় অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Participatory culture is an opposite concept to consumer culture in other words a culture in which private individuals (the public) do not act as consumers only, but also as contributors or producers (Prosumers). The term is most often applied to the production or creation of some type of published media".

অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির ধারণা খুব বেশি দিনের নয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এর ধারণা বাস্তবায়িত হয় কয়েকজন তরুণের হাত ধরে যারা নিজেদের প্রকাশনাসমগ্র অক্ষর বিন্যাস (Typing) এবং মুদ্রণের (Printing) কাজে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজে ব্যাপৃত হতো। কিছু মানুষের সমন্বয়ে(Network)এসব প্রকাশনা বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হতো যা সামাজিক নেটওয়ার্ক নামে পরিচিত পায়। পরবর্তীতে রেডিও, অনুষ্ঠান, যৌথ প্রকল্প (Group Projects), পারস্পরিক গল্পকথন (Gossips to Blogs) সমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য তা পায়। পরবর্তীতে ব্লগার, উইকিপিডিয়া, ফেসবুক, ফটোবাকেট, ইউটিউব প্রভৃতি ইন্টারনেটের (Internet) মাধ্যমে সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, গণতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের মাধ্যমে অংগ্রহণমূলক সংস্কৃতি আরো বেশি প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে শিক্ষা পরিকল্পনায় অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি দেশ ও সমাজ সাপেক্ষে ভিন্নতর মাত্রা এনেছে।

অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির নিয়ামক শক্তি হল জনগণ। এটি একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকলের সৃজনশীল ও সক্ষমতার উপর আস্থা রাখার বিষয়টি প্রধান। এক্ষেত্রে নিজেদের বহুমুখী শক্তি সংশ্লেষণের মাধ্যমে একটি ইতিবাচক কর্মপরিবেশ তৈরি করতে হয় যার মাধ্যমে অনেকের সঙ্গে একসাথে কাজে অংশ নেয়া যায়। অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির উন্নয়নের দর্শন হলো- ন্যায্যতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়তা করা, পারস্পরিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতি নজর রেখে তার থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল আনয়নে সচেষ্ট থাকা, গণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের সম্পদ, জ্ঞান, দক্ষতার উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন উদ্দেশ্য, দর্শন ও কর্মসূচি নির্ধারণে সহায়তা করা।

শিক্ষায় অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি

শিক্ষায় অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির জোরালো প্রভাব রয়েছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার পর তা কেন্দ্র থেকে বিকেন্দ্রীকরণে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যন্ত বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক,

অভিভাবক প্রত্যেকেই এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা পরিকল্পনা কখনও অফিস প্রধান বা বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি একা সম্পাদন করতে পারে না। তাই সুষ্ঠুভাবে কার্য-সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সকল বিষয় খোলামেলাভাবে বুঝিয়ে দিতে হয় যেন কারোর দায়িত্ব সম্পর্কে তাঅস্পষ্টতা না থাকে। এই বিস্তরন যত কার্যকরী হবে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মী বাহিনী নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে ততই সচেতন হবে। এই সচেতনতা ও অংশগ্রহণমূলক কর্মস্পহা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিকে সাফল্যের মূল শিখরে পৌঁছুতে সাহায্য করে। যেমন- শ্রেণিকক্ষে সামাজিক ও অংশীদারমূলক প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে একজন শিক্ষক তাঁর পাঠকে শিক্ষার্থীর নিকট আরো কার্যকরভাবে গ্রহণ করাতে সক্ষম হন। এতে করে শিক্ষার্থী তার পঠিত বিষয় সম্পর্কে আরো নতুন তত্ত্ব, তথ্য জানতে সক্ষম হয়। জ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য ভান্ডারের নিজকে সম্পৃক্ত করতে পারঙ্গমতা অর্জন করে। এতে করে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষা সহায়ক কর্মচারী সকলের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেমন সম্ভব হয় তেমনি নিজেদের মধ্যে জড়তা কাটিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে তৎপর হয়ে উঠতেও সহায়ক হয়।

অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির সুবিধা

পরস্পর সম্পর্কিত এবং পরিপূরক কার্যাবলি সম্পাদনে অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির কতগুলো ইতিবাচক দিক রয়েছে। ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনদের সাথে নিয়ে বসে সম্পদ, লোকবল, বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে সকলে সম্পৃক থাকে বলে তাতে সাফল্য প্রায়ই নিশ্চিত থাকে।

- সংশ্লিষ্ট সকলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত থাকে বলে কাজেও সকলকে অংশীভুত করায় যথাসময়ে কর্মসম্পাদনের মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। কাজে টিম স্পিরিট (দলীয় গতি) আসে এবং সহজে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়।
- অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। অভিজ্ঞজনরা তাদের ভাবধারার বিস্তরন ঘটাতে পারেন। অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞরা তাদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কাজের গুণগতমান বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারেন।
- অভিজ্ঞ, স্বল্প অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ সকলে মিলেমিশে কাজ করেন বিধায় জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে কাজটি যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়।
- প্রয়োজনে মিলেমিশে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটানো যায়।
- ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি তৈরি হয় এবং স্বীয় মনোবল বৃদ্ধি পায়।

অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির প্রতিবন্ধকতা

অংশগ্রহণমূলক কর্ম-সম্পাদনে একাধিক ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা থাকায় অনেক সময় নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কার্যত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের ভূমিকা থাকে মুখ্য। কিন্তু বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত অর্পিত হয় অধস্তনদের উপর। কার্য-সম্পাদন সুষ্ঠু ও সুন্দর হলে তার কৃতিত্ব প্রায়ই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের উপর বর্তায়। আর কার্য-সম্পাদনে সাফল্য না আসলে অধস্তনরা নিন্দার মুখে পড়েন। ফলে তারা কাজের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। তাই অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেতন এবং নিরপেক্ষতার ধারা বজায় রাখা জরুরি। তবে এক্ষেত্রে কিছুটা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য বজায় রাখতে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রতিন্ধকতা দূর করার উপায় সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া ব্যক্তিত্ব প্রফেসর হেনরি জেনকিন্স (Henry Jenkins) বলেছেন, ”... To develop the cultural competencies and social skills needed. Fostering these skills, the authors argue, requires a systemic approach to media education, schools, after school programs and parents all have distinctive roles to play”.

অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির প্রবিন্ধকতা দূরীকরণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এগুলো হল–

- উর্ধ্বতন ও অধস্তন সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা। উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মকর্তারা মিলে মিশে যদি একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলেন তবে সকল কাজ সহজ হয়।
- অর্থব্যয়ের সাথে সে সকল কর্মকর্তা জড়িত তাঁদের আর্থিক লেনদেন, দরপত্র ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কিত আইন কানুন ভালোভাবে জানা আবশ্যক। তাই দায়িত্ব অর্পনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।
- অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তিরস্কার ও আর্থিক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এর ফলে অন্যরা অধিকতর সাবধানতার সাথে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে।
- যে কোন ভালো কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আর্থিক পুরস্কার অথবা স্বীকৃতিমূলক সনদ দেয়া যেতে পারে। এতে করে অন্যরাও কাজে উদ্বদ্ধ হয়ে উঠবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির ধারণা প্রথমবারের মত বাস্তবায়িত হয়–
ক. উনিশ শতকের প্রথমার্ধে
খ. উনিশ শতকের শেষার্ধে
গ. আঠারো শতকের প্রথার্ধে
ঘ. উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে

২. অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির নিয়ামক শক্তি হল–
ক. জনগণ
খ. সরকার
গ. সাংবাদিক
ঘ. শিক্ষক

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিন।
২. অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির সুবিধা বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষায় অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
২. অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতির প্রতিবন্ধকতা হতে উত্তরনের উপায় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৪.৭: সাংগঠনিক বিদ্যমান অবস্থা- সংজ্ঞা, গুরুত্ব, ধরন ও ব্যাপ্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সাংগঠিনক বিদ্যমান অবস্থা বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সাংগঠনিক বিদ্যমান অবস্থার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাংগঠনিক বিদ্যমান অবস্থার ধরন কি তা বলতে পারবেন।
- সাংগঠনিক বিদ্যমান অবস্থার ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সাংগঠনিক আচরণ বা সাংগঠনিক বিদ্যমান ব্যবস্থা

সাংগঠিনক আচরণ হলো এমন এক ধরনের ব্যবস্থা যা ব্যক্তিকে তার বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও ধারণা দ্বারা সংশ্লিষ্ট সংগঠনে পরিচালনায় সাহায্য করে। সংগঠন হলো ব্যক্তি ও দলের সমষ্টি। ব্যক্তি ও দলের আচরনে যেমন বিভিন্নতা আছে, তেমনি সংগঠনেও তদ্রুপ পরিলক্ষিত হয়। আবার কোন ব্যক্তি একটি দলের মাঝ থেকে যে দলগত আচরণ করে, দলের বাইরে থাকলে সে একই আচরণ নাও করতে পারে। কাজেই সাংগঠনিক আচরণি বুঝার জন্য একদিকে যেমন ব্যক্তির ও দলের আচরণ সম্পর্কে জানা দরকার তেমনি সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে থেকে ব্যক্তি ও দলের আচরণের কি পরিবর্তন ঘটে তাও জানা প্রয়োজন। সাংগঠনিক আচরণের উদ্ভবের স্থান ও সময় নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে প্রাচীনকাল থেকে মানব সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে যে এর বিকাশ হয়েছে সেটি অনুমান করা যায়। মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই মানুষের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। যখন থেকে মানুষ সংগঠিত হয়ে সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করতে শিখেছে তখন থেকেই সাংগঠনিক আচরণের বিকাশ শুরু হয়েছে।

উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবের পর কল-কারখানার প্রসার ঘটতে শুরু করলে অধিক সংখ্যক মানুষ একসাথে কাজ করতে শুরু করে। তখন এত সংখ্যক শ্রমিকের কাজের ব্যবস্থাপনা, তদারকির জন্য ব্যবস্থাপকের পদ তৈরি হয়। ব্যবস্থাপকের সাথে অধীনস্ত কর্মচারীদের সম্পর্কের বিষয়টির মাধ্যমেই সাংগঠনিক আচরণের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। শিল্প বিপ্লবের পূর্বে মানব সংগঠনসমূহ এত স্বল্প পরিসরে পরিচালিত হতো যে সেখানে কোন আনুষ্ঠানিক আচরণের তেমন প্রয়োজন হতো না। কিন্তু পরবর্তীতে সংগঠনের আকার, শিল্প-কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আচরণিক সমস্যাও বাড়তে থাকে। প্রয়োজন দেখা দেয় ভিন্ন ভিন্ন দলকে ভিন্ন পদ্ধতিতে উৎসাহিত করে কর্মপরিবেশ অনুকূলে রাখার। কেননা কাজের সন্তুষ্টি বাড়াতে না পারলে সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হতো না। তাই কালের বিবর্তনে শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সাথে সাথে সাংগঠনিক আচরণও অবশ্যম্ভাবী উপাদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সাংগঠিনক অবস্থান সম্পর্কে উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে, “Organinization climate (Sometime known as corporate climate) is the pssocess of quanlifying the ‘culture’ of an organization and it precedes the notion of organizational culture. It is a set of properties of the work environment, preceived, directly or indirectly by the employees, that are assumed to be a major force in influencing employee behavior.”

আবার G. A. Frohand এবং B. H. Gilmer১৯৬৪ সালে সাইক্লোজিক্যাল বুলেটিনে সাংগঠনিক আচরণেরসংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে- "Climate consists of a set of characteristics that describe an organisation, distinguishesone organization from other organisations are relatively enduring overtime and influence the behaviours of people in it".

Research in Organizational Behaviour-এর গ্রন্থকার লেরি এল. কামিংস (Larry L. Cummings)-এর মতে, সাংগঠনিক আচরণ সংগঠনের মানবীয় আচরণের সরাসরি হৃদয়ঙ্গম, পূর্বানুমান এবং নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্ক।

উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সাংগঠনিক আচরণ হলে সংগঠনে কার্মরত মানুষের মানবিক আচরণসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং সঠিক প্রয়োগ যা অপরাপর সামাজিক উপাদানের সাথে সম্পৃক্ত।

সাংগঠিনক আচরণ বিষয়ে প্রাথমিক চিন্তাবিদগণ

উনিশ শতকের প্রথমভাবে রবার্ট ওয়েন নামক একজন ইংরেজ শিল্পপতি তাঁর ব্যক্তিগত শিল্প কারখানায় কিছু অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি কারখানার শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশু শ্রমিকদের কাজের ন্যূনতম বয়স সীমা নির্ধারণ করেন। শ্রমিকদের জন্য মধ্যাহ্নের আহার সরবরাহ করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা, সন্তানদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া শিল্প-কারখানার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগও গ্রহণ করেন।

বিশ শতকের প্রথমভাগে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক ফ্রেডারিক উইনস্লো টেলর (Frederic Winslow Taylor) উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল নিয়ে কাজ করেন। তিনি শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। লক্ষ্য মাত্রার নিচে উৎপাদনকারী শ্রমিকদের তিনি কমহারে মজুরি প্রদানের নিয়ম করেন। এর ফলে অধিক দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকরা যেমন কাজে উৎসাহ পেতেন তেমনি কম দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকরা তাদের কাজের মান উন্নয়নে আগ্রহী হতেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এলটন মেয়ো (Elton Mayo) ও তার সহযোগীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের কাছে জিইসি (General Electric Company)- রহথর্ন (Hawthorne) কারখানায় ১৯২৭ সাল হতে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত একটি সমীক্ষন পরিচালনা করেন যা হর্থন সমীক্ষা নামে পরিচিত। এই সমীক্ষায় তারা বস্তুগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির সাথে কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টি পরিমাপ করেন। তারা লক্ষ্য করেন যে, শুধু বস্তুগত সুযোগ সুবিধা নয় বরং কারখানা ব্যবস্থাপকের মনোভাবের আন্তরিকতার সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি জড়িত। গবেষণা কার্যটি সংগঠিত হয় একটি কারখানায় যেখানে মহিলা শ্রমিকরা নিযুক্ত ছিল। সেখানে আলোর পরিমান বাড়ানো হলো অথচ অপর কারখানায় আলো পূর্বাবস্থায় রাখা হলো। কিছুদিন পর দেখা গেল দুই কারখানাতেই উৎপাদন বেড়েছে। অথচ গবেষক দল ভেবেছিলেন যেখানে আলোর পরিমাণ বাড়ানো হয়নি সেখানে উৎপাদনশীলতা আগের মতই থাকবে। কারণ অনুসন্ধান করা হলে দেখা গেল, সংশ্লিষ্ট কারখানার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে ব্যবস্থা নিচ্ছেন– এই ধারণা পোষণ করায় শ্রমিকদের কাজে মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গবেষণায় প্রমাণিত হয় শুধু বস্তুগত সুযোগ সুবিধা নয় বরং শ্রমিকদের প্রতি ব্যবস্থাপকের ও প্রতিষ্ঠানের মনোভাব ইতিবাচক হলে শ্রমিকরা কাজে অধিকতর আন্তরিক হয় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

হথর্ন (Hawthorne) সমীক্ষার ফলাফল শিল্প-কারখানার ব্যবস্থাপকদের যথেষ্ট প্রভাবিত করে। এরই ফলশ্রুতিতে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নামে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মূল বক্তব্য হলো, সামাজিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে মানুষ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। উদ্বুদ্ধকরণ অর্থনৈতিক প্রয়োজনের চেয়ে সামাজিক প্রয়োজনের উপর সে বেশী নির্ভর করে। সন্তুষ্ট শ্রমিক বা কর্মীরা অসন্তুষ্ট কর্মীদের চেয়ে বেশি কাজ করে।

১৯৫০'র দশকের শেষ দিকে এবং ষাট দশকের প্রারম্ভে সাংগঠনিক আচরণ একটি পৃথক এবং পরিণত বিষয় হিসেবে গড়ে ওঠে। যার ব্যাপক চর্চা ও বিকাশ ঘটে সত্তর ও আশির দশকে।

সাংগঠনিক আচরণের গুরুত্ব

বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিষ্ঠা, ভিশন এবং মিশন অনুযায়ী সাংগঠনিক আচরণের গুরুত্বের বিভিন্নতা রয়েছে। ফ্লোরিডা ইনস্টিটিউট অব টেক ব্যবস্থাপক উইন্ডি ফিশার (Wendy Fisher) সাংগঠনিক আচরণের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন, "As we all know, the environment of a work place is critical to the general mood of your employs. Having a pleasant working environment is the simple part, how to get it is hard work. ... Just like measuring the weather climate, you are measuring the climate of your organization. What is yours organizational climate and how do you improve yours to increase the morale, overall happiness and employee retention of your workplace environment?"

কর্মপরিকল্পনা ও পরিকল্পনার ইতিবাচক ফলাফল আনয়নে সাংগঠনিক আচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হল–

১. **লক্ষ্য অর্জন:** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ব্যবস্থাপনা করা হয়।

২. **দক্ষতা বৃদ্ধি:** উদ্দেশ্য অর্জনের পাশাপাশি সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা করা সম্ভব।

৩. **উপকরণের উন্নয়ন:** ব্যবসা-বাণিজ্যের ছয়টি উপকরণের (শ্রমিক, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, বিনিয়োগ, পদ্ধতি, বিপনন) সংগ্রহ, যথাযথ সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা করা যায়।

৪. **উপকরণসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার:** ব্যবসা বাণিজ্যের ছয়টি উপকরণ থাকা সত্ত্বেও এগুলোর ব্যবহারে যদি সমন্বয় সাধন করা না যায় তবে লক্ষ্য অর্জন বিফল হতে বাধ্য। তাই দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপকরণসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৫. **মানব সম্পদের যথার্থ ব্যবহার:** একজন দক্ষ ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে জনবল সুষ্ঠুভাবে শ্রমে নিয়োজিত হয়। এতে ব্যবস্থাপকের সাথে কর্মীর সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং কাজের অগ্রগতি নিশ্চিত হয়।

৬. **শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা:** যে কোন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুশৃঙ্খল পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। একজন ব্যবস্থাপকের কর্মশৈলীর উপর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় সাধন ও উন্নয়ন নির্ভর করে। প্রতিটি বিভাগের মধ্যে সুশৃঙ্খল পরিবেশ সাফল্য নিশ্চিত করে।

৭. **নেতৃত্ব প্রদান:** সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ব্যতীত কোন মতবাদ, দলীয় কার্যাবলী অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। Organizing Ginius গ্রন্থ প্রণেতা এবং মার্কিন শিক্ষাবিদ ওয়ারেন বেনিস (Warren Bennis)-এর মতে "Leadership is the capacity to translate vision into reality" যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

৮. **অপচয় হ্রাস:** স্বল্প খরচে অধিক উৎপাদনে নিশ্চিত করতে হলে ব্যবস্থাপনার পরিবেশ ঢেলে সাজাতে হয়। ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের কাজের মানও দক্ষতা বৃদ্ধি করে, উৎপাদনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করে। উৎপাদনের সব উপকরণসমূহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানের অপচয় হ্রাস করে।

৯. **সম্পর্ক উন্নয়ন:** সঠিক ব্যবস্থাপনা পরিবেশ মালিক শ্রমিক অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত সকল পক্ষের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে। শুধু তাই নয় সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্রেতা বা ভোক্তা এবং

বিদেশী উদ্যোক্তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেশীয় উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি বিদেশী উদ্যোক্তদের সাথেও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১০. **গবেষণা ও উন্নয়ন:** সমাজ বিজ্ঞানীরা যেসব তত্ত্ব প্রদান করেন তার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটে একজন দক্ষ ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে। সাংগঠনিক আচরণ (Climate) এবং আরচণিক চিন্তা (Cultere thinking)-এর সমন্বয় করে তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি নতুন নতুন ভাবনার সংযুক্তি ঘটাতে গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সাংগঠনিক আচরনের ধরন

কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনে প্রতিটি কর্মীর ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন হলো সাংগঠনিক আচরণের মূল বক্তব্য। সংগঠনের প্রতিটি কর্মীর সাংগঠনিক ভূমিকা সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হতে হয়। এই ভূমিকাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে তিনটি ধরন বা মাত্রা (Dimension)-র প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এগুলো হলো–

১. **একতরফাভাবে কর্তৃত্ব স্থাপন:** যে যে ব্যক্তি সংগঠনের যে সব দায়িত্বে আছেন তিনি লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি করা প্রয়োজন সে বিষয়ে একক ভূমিকা গ্রহণ করবেন। দলের কাজের মান ধরে রাখার স্বার্থে তিনি যে কোন ধরনের সুপারিশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন। যে সব সুপারিশ গ্রহণ করলে প্রতিষ্ঠানের কাজের সুনাম ক্ষুন্ন হতে পারে সে জাতীয় সুপারিশ তিনি কঠোরভাবে বাতিল করবেন।

২. **বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ:** সাংগঠনিক বিদ্যমান ব্যবস্থায় অনেক সময় আনুষ্ঠানিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। এ বিষয়টি অবশ্য কতগুলো সম্পর্কের উপর গড়ে ওঠে। যেমন- আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, দল, উপদল, এক দেশীয় সংস্কৃতি, এক ধর্ম ইত্যাদি। অনেক সময় ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা মাধ্যম হতে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তাই অনানুষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে একজন ব্যবস্থাপক সঠিক অর্থেই ব্যবসার উন্নয়নে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। তাছাড়া বিভিন্ন দল থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

৩. **লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:** ব্যবস্থাপনা পরিসর সাংগঠনিক আচরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি সংগঠনের কতগুলো ধাপ হবে তা নির্ভর করে, ব্যবস্থাপনা পরিসরের উপর। সীমিত সংখ্যক অধঃস্তন কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মচারীর কাজ তাকে দেখা শোনা করতে হয়। তবে সংগঠনের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী এ সংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে। যেহেতু, একজন ব্যবস্থাপককে সীমিত সংখ্যক ব্যক্তির কাজ দেখাশুনা করতে হয় সেহেতু সংগঠনের কাজের সুবিধার্থে তিনি বিভিন্ন ধাপ বা স্তর তৈরি করবেন। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যা কিছু করা প্রয়োজন তিনি তাই করবেন।

সাংগঠনিক আচরণের বহুমুখীতা

সামাজিক সংগঠনে শ্রমিক বা কর্মীদের সংগঠনের সাথে একাত্মতা বোধে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এখানে কর্মী বাহিনী নিজেদের সংগঠনের অংশ হিসেবে গণ্য করে এবং সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনে নিজেদের অবদান রেখে গৌরবের অংশীদার হতে নিরলস পরিশ্রম করে। মানবিক সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলোর মৌলিক চাহিদার স্বীকৃতি রয়েছে। সংগঠনের সাফল্যে বহুমুখী মাত্রার ধরন লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হলো–

- ক্ষমতা সাধারণত প্রধান কর্মকর্তা বা নির্বাহীর নিকট কেন্দ্রীভূত থাকে। তবে মাঝে মাঝে তা বিভিন্ন দল বা দলগোষ্ঠীর কাছেও থাকতে পারে।
- প্রত্যেক ব্যবস্থাপক, অধস্তন কর্মকর্তা, কর্মচারীর মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ দক্ষতা (Inter-Personal Relations) বজায় থাকে। এছাড়া কর্তব্য ও দায়িত্ব-পালনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক, প্রথাবদ্ধ আচরণের বাইরে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে।

- সাংগঠনিক আচরণের সাথে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত থাকতে পারে। একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক সেটি নিমূর্লে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হবেন। তবে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত যদি গঠনমূলক হয় তবে সেটি অপরিহার্য ভেবে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- সাংগঠনিক কার্যক্রমে সাধারণত অধস্তন থেকে ঊর্ধ্বস্তন পদক্রমে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালিত হয়ে থাকে। তবে কতর্ব্য ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক, সিস্টেমের বাইরের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক দলবদ্ধতা কাজ করে থাকে।
- সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সাধারণত কঠোর বিধিবদ্ধ পদ্ধতির মধ্যে তা করা হয়ে থাকে। তবে পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে নমনীয়তা আনয়ন করাও সম্ভব।
- প্রাতিষ্ঠানিক বৃহৎ স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে রাখতে হয়। অধিকন্তু সাংগঠনিক উদ্দেশ্য ও ব্যক্তির উদ্দেশ্যের মধ্যে যাতে কোন অসঙ্গতি বা সংঘাত তৈরি না হয় সেটিও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।
- নতুন কোন পদ্ধতি বা উপায় উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করার জন্য কর্মীদের উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত, যথোপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আবার ইতিবাচক সাফল্যের জন্য পুরষ্কারের ব্যবস্থা করাও যেতে পারে। এছাড়া অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে যারা ব্যর্থ হবে তাদের জন্য তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখারও প্রয়োজন রয়েছে।
- ব্যবসায় সংগঠনের ব্যবস্থাপনার আচরণে যোগাযোগ রক্ষার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যবসায় সংগঠনের ব্যবস্থাপনাকে সমাজের বিভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠী ও সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়। যেমন- সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, জনগণকে পণ্যের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিতকরণ, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৭

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ”সাংগঠনিক আচরন হলো চিন্তনের একটি উপায়”– কার উক্তি?
ক. জি. এ. করহ্যান্ড
খ. বি. এইচ. গিলমার
গ. লেরি এল. কামিংস
ঘ. উইলিয়াম ফকনার

২. হথর্ন সমীক্ষার প্রয়োগকর্তা কে?
ক. এলটন মেয়ো
খ. ফ্রেড হুবার
গ. উইন্ডি ফিশার
ঘ. ওয়ারেন বেনিস

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সাংগঠনিক বিদ্যমান অবস্থা কি?
২. সাংগঠনিক বিদ্যমান অবস্থার উদ্ভব সম্পর্কে লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সাংগঠনিক বিদ্যমান অবস্থার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. সাংগঠনিক বিদ্যমান অবস্থার ধরন পর্যালোচনা করুন।
৩. সাংগঠনিক বিদ্যমান অবস্থার ব্যপ্তি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৪.৮: তত্ত্বাবধান-ধারণা, অর্থ, শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্বাবধানের প্রকৃতি ও লক্ষ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তত্ত্বাবধানের ধারণা ও অর্থ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- তত্ত্বাবধানের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্বাবধানের প্রকৃতি ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তত্ত্বাবধানের ধারণা ও অর্থ

সাধারণ অর্থে তত্ত্বাবধান বলতে পরিদর্শন, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ, দেখাশোনা করা বোঝায়। তত্ত্বাবধানের মধ্যে তত্ত্ব ও 'অবধান' এই দুইটি শব্দ রয়েছে। এই দুইটি শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করলে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হলো প্রকৃত অবস্থার স্বরূপ সন্ধানের জন্য বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা। শিক্ষা বিজ্ঞানে তত্ত্বাবধানের ব্যবহারিক অর্থও প্রায় একই রকম। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরা, তদানুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, পরিচালনা করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করাকেই তত্ত্বাবধান বলে। গুণগত শিক্ষার নিশ্চিতকরণে তত্ত্বাবধানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

তত্ত্বাবধানের সংজ্ঞা

১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ সালের নিউ অক্সফোর্ড আমেরিকান ইংলিশ ডিকশনারিতে তত্ত্বাবধান সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Supervision is the act on function of overseeing something on somebody". পেনস্টেট ওয়ার্ড ক্যাম্পাসে তত্ত্বাবধান সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Educational supervision is a term used to identify the work duties of administrative workers in education. Educational supervisors make sure the educational institution operates efficiently and within the legal requirements and rules". এখানে আরো বলা হয়েছে "In modern educational thought, supervision is a phase of administration with particular emphasis on the products of teaching activities. Educational administration and supervision are regarded as the total processes inclusive of all responsibilities and functions necessary for running a school".

শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্বাবধানের প্রকৃতি ও লক্ষ্য

শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্বাবধানের প্রকৃতি ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে ছয়টি দিক লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হলো– প্রগতিশীল, পেশাগত লক্ষ্য, গণতান্ত্রিক আচরণ, দায়িত্বশীলতা ও কর্মতৎপরতা, দর্শনগত ভিত্তি এবং সৃজনশীল ও গঠনমূলক কর্মতৎপরতা। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. প্রগতিশীলতা

- পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেন অনিয়ম না হয় তা লক্ষ্য করা।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেন কমে না যায় তা লক্ষ্য করা।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীরা যোগাযোগ ক্ষেত্রে সহজগম্যতা নিশ্চিত করা।
- প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যয়ের উৎসের যোগান সম্পর্কে সচেতন থাকা।

২. পেশাদারীত্ব বজায় রাখা

- বিশেষায়িত রক্ষাকারকের ভূমিকা পালন করা।
- দ্রুত বর্ধনশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিষয়ে খোঁজ রাখা।
- জ্ঞান ও কৌশলগত আচরণ দ্বারা তত্ত্বাবধান করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. গণতান্ত্রিক আচরণ করা

- বিভিন্ন সামাজিক শক্তির গতি প্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজ রাখা।
- বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।
- সামাজিক নির্দেশকরূপে সমাজের মানুষের আস্থাভাজন হওয়া।

৪. দায়িত্বশীল কর্মতৎপরতা

- সমাজে নিজের ভাবমূর্তিতে উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
- নিজের অর্পিত আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দেয়া।
- উদাহরণে মৌলিকত্ব বজায় রাখা।

৫. দর্শন অনুযায়ী কাজ করা

- সামাজিক স্পর্শকাতর বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
- নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন ও কর্মের সাফল্য মূল্যায়ন করা।
- নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ ও তার প্রয়োগকরণ।

৬. সৃজনশীল ও গঠণমূলক কার্যক্রম

- শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয় সব ব্যবস্থার যথাযথ তত্ত্বাবধান।
- শিক্ষার সকল ক্ষেত্রের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা দেখা।
- শিখন ও শিক্ষণে কোন ত্রুটি আছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করা। এতটি থাকলে তা কী উপায়ে দূর করা যায় তার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষায় প্রকল্প গৃহীত হওয়ার পর থেকে বাস্তবায়নের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়কালে এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন রয়েছে। প্রকল্পের কার্যাবলির নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় তত্ত্ব বা তথ্য যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এছাড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তার প্রতি লক্ষ্য রাখা ছাড়াও উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানে প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে সজাগ ও সক্রিয় করে তার সাথে সাথে কাকে, কখন, কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সাধারণত তত্ত্বাবধান বিষয়টি শিক্ষার চেয়ে প্রশাসনের সাথে অধিকতর সংযুক্ত। তত্ত্বাবধানকারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক নাও হতে পারেন তবে তিনি অধিকতর নিরঙ্কুশ প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিকারী। তাঁর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে একজন শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। ইপ্সিত লক্ষ্যার্জনে সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা তাই জরুরি। কেননা সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা না হলে সমস্যার সমাধানও করা যায় না। যেমন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সমস্যা সমাধানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর গত ২০১৬ সালে দেশের মোট ১৮ হাজার ৫৯৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬ হাজার ৪৪২টি বিদ্যালয় সুপারভিশন করা

হয়েছিল। মাউশির সর্বশেষ প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, সুপারভিশন করা বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রায় ৪৮ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারেন। বাকি ৫২ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ অন্য বিদ্যালয়ের সহায়তায় বা বাইরের মাধ্যম থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে প্রায় ৩১ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক অন্য বিদ্যালয়ের সহায়তায় এবং ২১ শতাংশ শিক্ষক বাইরের মাধ্যম থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করেন। শিক্ষকবৃন্দের সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে আগ্রহী ও বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে তাই তাদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেবার জন্য সুপারভিশনের কর্মকর্তারা সুপারিশ করেছিলেন। তাই বলা যায় নিয়মিত সুপারভিশনের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে যথার্থ মান অর্জন করা সম্ভব হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৮

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তত্ত্বাবধান বলতে বুঝায়?
ক. শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরা
খ. শিক্ষানীতি প্রণয়ণ করা
গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা
ঘ. শিক্ষক নিয়োগ করা

২. তত্ত্বাবধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কয়টি?
ক. পাঁচটি
খ. ছয়টি
গ. চারটি
ঘ. আটটি

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. তত্ত্বাবধানের সংজ্ঞা দিন।
২. তত্ত্বাবধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় কি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. তত্ত্বাবধানের প্রকৃতি ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করুন।
২. তত্ত্বাবধানের শিক্ষার চেয়ে প্রশাসনের সাথে অধিকতর সংযুক্ত ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৪.৯: তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য, পেশা হিসেবে তত্ত্বাবধানের প্রক্রিয়া ও কর্মতৎপরতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিদর্শন কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- পেশা হিসেবে তত্ত্বাবধানের প্রক্রিয়া ও কর্মতৎপরতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পরিদর্শন

শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম সফল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক শিক্ষার্থী, শিক্ষা সহায়ক কর্মকর্তা কর্মচারী এবং অভিভাবকবৃন্দ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হলো পরিদর্শন। পরিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত প্রশাসনিক তদারকিই হলো পরিদর্শন। অর্থাৎ পরিদর্শনের মূলকথা হলো, “On closer inspection it looked like a fossil. ”Teindia.nic.in-এ পরিদর্শন সম্পর্কে বলা হয়েছে, “Supervision and inspection are considered to be the major planks of any strategy to improve the quality and standard of school education. ...In fact, it is the inspecting officers who supervise classroom instruction by virtue of their position in the educational administrative set up.” পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামোর স্তরগুলোর ব্যবহারিক আচরণ ও কর্মকান্ডকে গতিশীল ও মানসম্পন্ন করে লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা।

পরিদর্শনের পরিমাণ কয়েকগুণ হ্রাস-বৃদ্ধি করে কর্মক্ষেত্রের কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে তাৎক্ষণিক তত্ত্বাবধান করাই পরিদর্শনের সারকথা। পরিদর্শন শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও চলমান কাজগুলোর জন্য প্রযোজ্য।

তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য

- তত্ত্বাবধান একটি প্রতিষ্ঠানের চলমান প্রক্রিয়া। পরিদর্শন হলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত কর্মকান্ড।
- তত্ত্বাবধান সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং সার্বক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের উপর দৃষ্টি রাখতে হয়। কোন কর্মী যদি সঠিকভাবে, যথার্থভাবে দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয় তবে তাৎক্ষণিভাবে তাকে সংশোধন করার ব্যবস্থা নেয়া যায়। কিন্তু শিক্ষাকর্মীর কাজ যদি যথার্থভাবে সংঘটিত না হয় তবে পরিদর্শনের সময় তাকে ‘অসফল’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- তত্ত্বাবধানের সময় যদি কোন শিক্ষাকর্মীর ভুল ত্রুটি নজরে আসে তবে তা সংশোধন করা যায় এবং তার কাজের অগ্রগতি বাড়ানো সম্ভব হয়। এটি চলমান প্রক্রিয়া। কিন্তু পরিদর্শনের ফলে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে হয় ইতিবাচক অথবা নেতিবাচকরূপে চিহ্নিত করা হয়। সে ক্ষেত্রে সংশোধনের কোন উপায় তাৎক্ষণিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

পেশা হিসেবে তত্ত্বাবধানের প্রক্রিয়া ও কর্মতৎপরতা

সাধারণভাবে বলা যায়, একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক তদারককৃত অধঃস্তনদের তদারকি হলো তত্ত্বাবধান। একজন শিক্ষক ব্যবস্থাপকের অধীন যে কয়জন শিক্ষার্থী থাকে তাদের তদারকি, সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা তত্ত্বাবধানের মূল কাজ। সাধারণত একজন শিক্ষক ব্যবস্থাপকের পক্ষে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষা কর্মীর চেয়ে বেশিজনকে দক্ষতার সাথে এবং সমানভাবে তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয় না। যখন ঊর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তা তাঁর অধীনস্ত কর্মরত শিক্ষা কর্মীদের দক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে তদারক করতে পারেন তখন তাকে কার্যকর তত্ত্বাবধান বলে। পেশা হিসেবে তত্ত্বাবধানের প্রক্রিয়া ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

- শুধুমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ এলাকায় তত্ত্বাবধান করা;
- একটি সুনির্দিষ্ট তত্ত্বাবধান মডেল অনুসরণ করা;
- দ্বৈত নীতি তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়;
- তত্ত্বাবধান নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা;
- তত্ত্বাবধানের জন্য সর্বদা সহজলভ্য থাকা;
- কার্যকরভাবে তত্ত্বাবধান করা;
- তত্ত্বাবধান চলাকালে যে কোন আর্থিক হাতছানি উপেক্ষা করা;
- সর্বদা পেশাদারীত্ব আচরণ করা;
- সততার সাথে তত্ত্বাবধান কাজ সম্পন্ন করা;
- পূর্ববর্তী তত্ত্বাবধানের ফিডব্যাক গ্রহণ করা;
- সর্বদা নৈতিকতা বজায় রাখা;
- তত্ত্বাবধান করায় যথেষ্ঠ সময় ব্যয় করা;
- পেপারওয়ার্ক যথাযথ সম্পন্ন করা;
- তত্ত্বাবধানে ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিহার করা।

এসোসিয়েশন ফর সুপারভিশন এ্যান্ড কারিকুলাম ডেভেলপম্যান্ট নামে অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৪৩ সালে গড়ে ওঠে। এখানে ১২৮টি রাষ্ট্রের শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যক্তি সদস্য রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক, অধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এই প্রতিষ্ঠানটি একটি শিশুর বিদ্যালয় গমনের পর থেকে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ, বয়স্কদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ, নীতিগতভাবে যেসব হুমকীর সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে তত্ত্বাবধানের বিভিন্ন সুপারিশ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৯

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হলো–
ক. শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা–
খ. শিক্ষক নিয়োগ
গ. শিক্ষার্থী ভর্তি
ঘ. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

২. এসোসিয়েশন ফর সুপারভিশন এ্যান্ড কারিকুলাম ডেভেলম্যান্ট কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৪০
খ. ১৯৪৩
গ. ১৯৮২
ঘ. ১৯৬১

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পরিদর্শনের সংজ্ঞা দিন।
২. ASCD-এর গঠন ও কাজ লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
২. পেশা হিসেবে তত্ত্বাবধানের প্রক্রিয়া ও কর্মতৎপরতা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৪.১০: তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন- আধুনিক তত্ত্বাবধান কৌশল, গতিধারা, পেশাগত প্রশিক্ষণে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আধুনিক তত্ত্বাবধানের কৌশলগুলো বলতে পারবেন।
- পেশাগত প্রশিক্ষণে, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তত্ত্বাবধানের প্রধান কাজ হলো কর্মী পরিচালনা করা, তাদের কাজের মান নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষণিক তদারকি করা এবং ব্যবহার্য উপকরণসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা। এই তিনটি উপাদানের সমন্বিত কর্মতৎপরতাকে সক্রিয় রাখা, কর্মীদের মধ্যে প্রেষণা, উৎসাহ বজায় রাখা, উপকরণ সামগ্রীর সময়োপযোগী ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ শিক্ষা সহায়ক উপকরণ যেমন- পাঠ্য পুস্তক, সহপাঠ, পাঠের উপকরণ ইত্যাদি যথাসময়ে তৈরিকরণ ও সরবরাহের নিশ্চয়তাও এর অন্তর্ভুক্ত। তত্ত্বাবধানে শিক্ষা কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা, চাকুরীর পদোন্নতি, চাকুরীর নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিও রয়েছে। তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে এসব সমন্বিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ পরামর্শ প্রদানকরা হয়ে থাকে। Supervision সম্পর্কে wikipedia-তে বলা হয়েছে: the action or process of watching and directing what someone does or how something is done: the action or process of supervising someone or something.

ব্যবস্থাপক হিসেবে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সম্পর্কে Highered.mheducation.com-এ বলা হয়েছে“An individual who plans, organizes, directs and controls the work of others is an organization. আর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে- It Covers five key functions of planning, organizing, staffing, leading and controlling organizational resources for the attainment of results. Supervisions are an essential part of the management team”.

আধুনিক তত্ত্বাবধান কৌশল

একজন শিক্ষা ব্যবস্থাপক ঠিক কতজন শিক্ষা কর্মীর কাজ দেখাশুনা করতে সক্ষম হবেন তা সেই কাজের ধরন, পরিস্থিতি, সেই ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভর করে। শিক্ষা ব্যবস্থাপক যদি দক্ষতাসম্পন্ন না হন তবে কাম্যফল অর্জন করা সম্ভব হয় না। আবার একক ব্যবস্থাপকের পক্ষে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মীর চেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মীকে দক্ষতার সাথে সমানভাবে তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয় না। তাই একজন তত্ত্বাবধায়ককে আধুনিক তত্ত্বাবধান কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এগুলো হলো-

- সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা;
- অর্পিত দায়িত্ব পালন করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মপন্থা পরিচালনা করা;
- দলের সদস্যদের জন্য সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা;
- কর্মদক্ষতা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা;
- পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কাজের মূল্যায়ন করা।

বিদ্যালয়ের সার্বিক মান উন্নয়নে তত্ত্বাবধানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পূর্বেকার প্রথাগত তত্ত্বাবধান ছিল কর্তৃত্ববাদী এবং সেখানে শিক্ষকদের পেশাদারীত্বের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হতো না। আধুনিক তত্ত্বাবধান অনেক বেশি কৌশলী, এর গতিধারায় পেশাদারীত্বের সম্মিলন রয়েছে। এটি অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক এবং এর গতিধারায় গণতান্ত্রিকতা অনুসরণ করা হয়। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্য থেকে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের নিয়ে তত্ত্বাবধানের দিকটি পালন করা হয়। এছাড়া বাইরের তত্ত্বাবধানকারীও এর সাথে যুক্ত হতে পারেন। সমগ্র শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থায় শিক্ষকবৃন্দ তাদের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। শিক্ষকতায় ডেমোনেস্ট্রশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা, বিভিন্ন সেমিনার, অধিবেশন, কর্মশালার আয়োজন করা প্রভৃতি বিষয় তত্ত্বাবধান করাও আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব। এছাড়া শিক্ষকদের মান নির্ধারিন, প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মানের তুলনা, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের চাহিদা তৈরি ও নিয়োগে সুপারিশ করা, প্রতিষ্ঠানের ভবন ও অর্থ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুনের যথার্থ প্রয়োগ, প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হলে অর্থ সাহায্যের যথার্থ ব্যবহার, শিক্ষক ও শিক্ষা সহায়ককারীদের চাকুরীর নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়গুলোও তত্ত্বাবধানের অন্তর্ভুক্ত।

পেশাগত প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান আহরণ করে আর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেই জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ ঘটায়। প্রশিক্ষণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল অভিযোজনের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও আচরণের ইতিবাচক রূপান্তর ঘঠে। এই পরিবর্তন মানুষকে তার প্রত্যাশিত কার্যকর লক্ষ্য অর্জনে ব্যাপক সহায়তা করে। প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। এগুলোকে মোট চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে– অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ, দলগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কর্মী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।

পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধায়কের পেশাদারীত্বের জন্য আবশ্যক বিষয়। আরো যেসব বিষয়ের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ জরুরি সেগুলো হলো–

- বিদ্যালয় ব্যবস্থার সাথে জড়িত সকল পেশাজীবীর সার্বক্ষণিক মান উন্নয়ন করা;
- শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষক ও শিক্ষা সহায়ক কর্মীর অতীত অদক্ষতা দূর করা;
- নতুন নতুন জ্ঞানের তথ্য ভান্ডারে সম্পৃক্তকরণ;
- সৃজনশীল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা;
- নতুন শিক্ষকতার পেশায় জড়িতদের প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা প্রদান করা।

স্লাইড শেয়ার এ্যাপ-এ পেশাগত প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "In-service, we define as in-service training is a process and a part of continuing education that helps the teachers to gain greater insight into teaching. In this training tuckers become involved in order to broaden their knowledge, improve their skills and attitude."

পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক তত্ত্বাবধানকারী নিয়মমাফিক পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হন। শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত হলে শিক্ষা পরিকল্পনাবিদগণ দেশে বিরাজমান শিক্ষা ব্যবস্থার কোথায় দুর্বলতা আছে, কোন দিকটিতে অধিক মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন, নতুন কোন কোন তত্ত্ব তথ্য সংযোজন প্রয়োজন তা চিহ্নিত করেন। এটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। সঠিকভাবে এই কাজটি করা না হলে অর্থ, সময় ও কর্মশক্তির অপচয় ঘটে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক, শিখন প্রক্রিয়া যথার্থ হচ্ছে কিনা তা নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করা জরুরি। আর পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই কাজগুলো

সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘটাতে নিয়ন্ত্রণ শক্তিরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে যা একজন তত্ত্বাবধানকারীর অধীনে হয়ে থাকে।

প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত করাই হলো নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পরিকল্পনা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা প্রক্রিয়ার যাবতীয় কৌশল বিশেষ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আর পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অনুঘটক হিসেবে থাকে বাজেট। সুপরিকল্পিত বাজেট প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, কৌশল, ব্যবস্থাপনা, অর্থসম্পদ অথবা ভূসম্পদ এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পকে সমন্বিত করে। এই সমন্বয় সাধনে, প্রকল্পের যথার্থ বাস্তবায়নে একজন তত্ত্বাবধায়ক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১০

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আধুনিক তত্ত্বাবধান কৌশল কয়টি?
ক. ছয়টি
খ. সাতটি
গ. পাঁচটি
ঘ. আটটি

২. প্রশিক্ষণের ধরন কয়টি?
ক. চারটি
খ. পাঁচটি
গ. ছয়টি
ঘ. সাতটি

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. তত্ত্বাবধানের সংজ্ঞা দিন।
২. তত্ত্বাবধানের প্রধান কাজগুলো কি কি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আধুনিক তত্ত্বাবধানের কৌশলগুলো বর্ণনা করুন।
২. পেশাগত প্রশিক্ষণে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৪.১১: সমসাময়িক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বর্তমানকালে কিভাবে তত্ত্বাবধান করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশ এডুকেশন কোড সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বর্তমান কালের তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সমসাময়িক কালের তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা

সাধারণভাবে তত্ত্বাবধান শিক্ষার চেয়ে প্রশাসনে অধিকতর সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে শিক্ষা তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানের কাজের সঠিকতা, বিভিন্ন সৃজনশীলতা, প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ, পরিবীক্ষণ, অধীনস্থদের প্রতি নজরদারি, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তত্ত্বাবধানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর, অভিভাবক-শিক্ষক-শিক্ষার্থীর, সমাজ-অভিভাবক-শিক্ষক-শিক্ষার্থীর, বিদ্যালয়-প্রশাসন-সমাজের মিথস্ক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থার স্বরূপ তুলে ধরা, তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তত্ত্বাবধানকালে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনগুলো চিহ্নিত করা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাক্রমের বিষয়সহ সহশিক্ষামূলক বিষয়গুলোও পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া শিক্ষা কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা, চাকুরীর নিরাপত্তা, পদোন্নতি ইত্যাদিরও তত্ত্বাবধান করা হয়।

এডুকেশন কোড

ব্রিটিশ বাংলায় ১৯৩১ সালে "The Bengla Education Code" প্রণীত হয়েছিল যাতে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিল। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান পর্যন্ত এ কোড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত এই কোডে শিক্ষা নির্দেশক ও পরিদর্শন, কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা, সাধারণ নির্দেশ মত পরিচালিত বিদ্যালয় ব্যবস্থা, প্রাচ্য বিদ্যা, বিশেষ শ্রেণির জন্য বিশেষ শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, আবাসন সুবিধা, পরীক্ষা গ্রহণ, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, পাঠ্য বই কমিটি গঠন বিষয়ে ব্যাপক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ১৯৩১ সালের পর বাংলাদেশে আর কোন শিক্ষা কোড প্রণয়ন করা হয় নাই। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও শিক্ষা কোড প্রণয়নের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতেও এ বিষয়টি উপেক্ষিত রয়ে গেছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা কোড যে বর্তমানেও অতি প্রাসঙ্গিক সেটি চুয়াত্তর সালের খুদা কমিশনের সুপারিশেও লক্ষ্য করা যায়। এখানে বলা হয়েছে, "...এ ধরনের একটি 'এডুকেশন কোড' শেষবারের মত ১৯৩১ সালে সংকলিত হয়েছিল। এ সময়ের পরে বহু বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু আর নতুন কোন এডুকেশন কোড সংকলিত হয়নি। অথচ শিক্ষা ক্ষেত্রে নানাবিধ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অনেক নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বহু আইন কানুন ও নিয়মাবলীর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন হয়েছে। এ সকল অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সময়ে সময়ে অনেক আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি ও নির্দেশনামা জারী হয়েছে। সেসব সংকলিত করে প্রকাশ করা জাতীয় কর্তব্য। এ কারণে আমরা সুপারিশ করি যে 'এডুকেশন কোড' সংকলনের জন্য সরকারের একজন সচিবের পদমর্যাদা ও মানের একটি পদ দুই বছরের জন্য সৃষ্টি করে একজন

যোগ্য ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হোক। এ কাজে সহায়তা করার জন্য তাঁকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী দেওয়া ও অফিসেরও ব্যবস্থা করা হোক"।

তত্ত্বাবধানের সমস্যা নিরসনের উপায়

১. **প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ:** মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার আঞ্চলিক দপ্তরসমূহের তত্ত্বাবধানে স্ব স্ব অঞ্চলের মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্ব থাকবে। আঞ্চলিক দপ্তর নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুকরণে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি দান, স্বীকৃতি নবায়ন, স্বীকৃতি বাতিল, ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এমপিওভুক্তিকরণ এবং বেতন ভাতার সরকারি অংশের অর্থ বিলি বন্টন, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বদলীকরণ, পেনশন, গ্রাচুইটি, অফিস নথি প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ও পরীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনুসারে পদির্শনের পদ সৃষ্টি করতে হবে। পরিদর্শকবৃন্দ একাডেমিক তত্ত্বাবধানের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও পালন করবেন।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তত্ত্বাবধান ও দেখা শোনার জন্য বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে কোন ব্যবস্থা নেই। তাই উপজেলা পর্যায়ে একটি সহকারী পরিচালক ও একটি পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এভাবে শিক্ষা তত্ত্বাবধান রাজধানী থেকে বিকেন্দ্রীকরণ করে উপজেলা পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।

২. **পরিদর্শন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ:** পরিদর্শন ব্যবস্থাকে প্রশাসন ও একাডেমিক কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন। পরিদর্শন কাঠামোকে জেলা হতে উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করে শিক্ষা অধিদপ্তরের EMIS (Education Management Information System) কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসারিত করা ও আধুনিকায়ন জরুরি। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম ও তত্ত্বাবধান কাজে সহায়তা দানের জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩. **শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধায়নে সম্পৃক্তকরণ:** বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার সাথে জড়িত শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ায় অধিক হারে সম্পৃক্ত করতে হবে। মেধা, দক্ষতা আর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রশাসনে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

৪. **প্রশিক্ষণ:** তত্ত্বাবধানকারীদের প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত করার পূর্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষা কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগের অব্যবহিত পরে এবং পদোন্নতির পূর্বে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের নিয়ম করে সুষ্ঠু শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা অন্যতম পূর্বশর্ত। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক, বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষা সহায়ক কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক বুনিয়াদী, সজতীবনী, অভিযোজন প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

৫. **বৈষম্য দূরীকরণ:** একই এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, শিক্ষক ও কর্মচারীদেরও তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন। দেখা যায় শিক্ষক ও জনবল নিয়োগে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী অনুসরণ করে থাকে। আবার বেসরকারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী বেতনেরও ব্যাপক তারতম্য থাকে। এ সকল বৈষম্য দূরীকরণে তত্ত্বাবধায়কের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

৬. **সরকারিকরণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা:** বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এই নীতিমালায় সরকারিকরণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরি সংক্রান্ত নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যথাযথভাবে তত্ত্বাবধান

করা প্রয়োজন। নীতিমালা অনুযায়ী সর্ব শর্তপূরণ করা হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারিকরণের পক্ষে ইতিবাচক মন্তব্য করবেন।

৭. **অঅনুমোদন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ:** অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন এলাকায় অনুমোদনহীন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদরাসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুমোদনহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে এ সকল ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৮. **শিক্ষা ক্যাডারের উন্নয়ন:** শিক্ষা ক্যাডার পরিচালনায় আধুনিক তত্ত্বাবধান নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। শিক্ষকবৃন্দের মূল্যায়নের জন্য প্রচলিত এসিআর (Annual Confidential Report) ব্যবস্থার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। শিক্ষকবৃন্দের দক্ষতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন পদ্ধতি (Perform-based Assesment) অনুসরণ করা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিমওয়ার্ক বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির মূল্যায়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের র‌্যাংকিং এর উপর নম্বর অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। শিক্ষকবৃন্দের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার সাথে সাথে পারফরম্যান্সকেও গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষক এবং তার তত্ত্বাবধায়ক মিলে শিক্ষকের জন্য বার্ষিক, অর্ধ-বাষিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তিতে শিক্ষকবৃন্দকে মূল্যায়ন করা হবে। জ্যেষ্ঠতার কারণে একজন শিক্ষক পদোন্নতির জন্য সর্বাগ্রে গুরুত্ব পাবেন তখনই যখন তাঁর পারফরম্যান্স উপযুক্ত হবে।

৯. **প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধান:** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ বর্তমানে প্রায়ই স্থানীয় পর্যায়ের। তাঁদের কর্তব্যকার্যে দায়িত্বশীতার অভাব রয়েছে বলে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যায়। তাঁরা যাতে অর্পিত দায়িত্ব সঠিক ও সুষ্ঠুভাবেপালন করতে পারে সে জন্য তত্ত্বাবধান করা জরুরি। তত্ত্বাবধায়ক তাদের অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা তা পরিবীক্ষণ করবেন।

১০. **নারী তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে যাতে পরিদর্শন হয় তার তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন। পরিদর্শন ও প্রাসঙ্গিক কাজ সুষ্ঠুভাবে ও উপযুক্ত রূপ সম্পাদনের জন্য অধিক সংখ্যক পরিদর্শকের পাশাপাশি নারী পরিদর্শকের ও ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। আর তত্ত্বাবধায়ক পদে নারীর অংশগ্রহণে থাকাও যুক্তিযুক্ত। এ সুপারিশটি বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও প্রকাশ করা হয়েছিল। তবে অদ্যাবধি তার ইতিবাচক প্রতিফলন তেমনভাবে অনুসরণ করা হয়নি। আশা করা যায় বাংলাদেশ শিক্ষা আইন কার্যকর হলে তার সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ‘দ্য বেঙ্গল এডুকেশন কোড’ কবে প্রবর্তিত হয়েছিল?
ক. ১৯৩১
খ. ১৯৫৪
গ. ১৯০৬
ঘ. ১৮৮৫

২. ‘জাতীয় শিক্ষানীতি’ কবে প্রণীত হয়েছে?
ক. ১৯৭৪ সালে
খ. ১৯৮৮ সালে
গ. ২০১০ সালে
ঘ. ২০০৩ সালে

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বেঙ্গল এডুকেশন কোড কি?
২. তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বর্তমানকালে কিভাবে তত্ত্বাবধান করা হয় বর্ণনা করুন।
২. বর্তমানকালের তত্ত্বাবধানের সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব?